আরোহণ করে আত্মরক্ষা করা যায় অথবা মাটিতে প্রবেশ করে অন্যত্র চলে যাওয়া যায়। এস্থলে আল্লাহ্‌র ইবাদতকে একটি মাটি রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। মাটি যেমন শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়, সৎকর্মও তেমনি পরকালের আযাব থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এসব সৎ কর্মের মধ্যে প্রথমে فَكُّ رَقَبَةٍ অর্থাৎ দাসমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এটা খুব বড় ইবাদত এবং একজন মানুষের জীবন সুসংহত করার নামান্তর। দ্বিতীয় সৎ কর্ম হচ্ছে ক্ষুধার্তকে অন্নদান। যে কাউকে অন্নদান করা সওয়াবমুক্ত নয় কিন্তু কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর লোককে অন্ন দান করলে তা আরও বিরাট সওয়াবের কাজ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে ঃ

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ —অর্থাৎ বিশেষভাবে যদি আত্মীয় ইয়াতীমকে অন্নদান করা হয়, তবে তাতে দ্বিগুণ সওয়াব হয়। এক. ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করার সওয়াব এবং দুই. আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার সওয়াব। فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ —অর্থাৎ বিশেষভাবে ক্ষুধার দিনে তাকে অন্ন দান করা অধিক সওয়াবের কারণ হয়ে যায়। এমনিভাবে ধূলায় লুন্ঠিত মিসকীন অর্থাৎ নিরতিশয় নিঃস্ব ব্যক্তিকে অন্নদান করাও অধিক সওয়াবের কাজ। এরূপ ব্যক্তি যত বেশী অভাবী হবে, অন্নদাতার সওয়াবও ততই বৃদ্ধি পাবে।

অপরকেও সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া ঈমানের দাবী ঃ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ এ আয়াতে ঈমানের পর মু'মিনের এই কর্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সে অপরাপর মুসলমান ভাইকে সবর ও অনুকম্পার উপদেশ দেবে। সবরের অর্থ নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা ও সৎ কর্ম সম্পাদন করা। مرحمة-এর অর্থ অপরের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া। অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে তাকে কষ্টদান ও জুলুম করা থেকে বিরত হওয়া। এতে দীনের প্রায় সব নির্দেশই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

سورة الشمس

সূরা শাম্‌স

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ১৫ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝٢ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝٣ وَالَّيْلِ
اِذَا يَغْشٰهَا ۝٤ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝٥ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝٦ وَنَفْسٍ
وَّمَا سَوّٰهَا ۝٧ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝٨ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝٩ وَقَدْ
خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝١٠ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَآ ۝١١ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰهَا ۝١٢
فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝١٣ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۝
فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰهَا ۝١٤ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝١٥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, (২) শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে, (৩) শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে, (৪) শপথ রাত্রির যখন সে সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে, (৫) শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তার, (৬) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তার, (৭) শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তার, (৮) অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন, (৯) যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। (১০) এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (১১) সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত মিথ্যারোপ করেছিল (১২) যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল, (১৩) অতঃপর আল্লাহ্‌র রসূল তাদেরকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক। (১৪) অতঃপর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং উষ্ট্রীর পা কর্তন করেছিল। তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে একাকার করে দিলেন। (১৫) আল্লাহ্‌ তা'আলা এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের (অস্ত যাওয়ার) পেছনে আসে (অর্থাৎ উদিত হয়। এখানে মধ্য-মাসের কয়েক রাত্রির চাঁদ বোঝানো হয়েছে। এ সময়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর চন্দ্র উদিত হয়। একথা যোগ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এটা পরিপূর্ণ নূরের সময় ; যেমন وضحها বলে সূর্যের পরিপূর্ণ নূরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা এ সময় কুদরতের দু'টি নিদর্শন সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় মিলিতভাবে একের পর এক প্রকাশ পায়)। শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে, শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে (ও তার প্রভাব ও আলোকে সম্পূর্ণরূপে) আচ্ছাদিত করে। (অর্থাৎ রাত্রি গভীর হয়ে যায়, তখন সূর্যের কোন প্রভাব অবশিষ্ট থাকে না। পরিপূর্ণ অবস্থার শপথ করার জন্য প্রত্যেকটির সাথে 'যখন কথাটি বারবার' যোগ করা হয়েছে)। শপথ আকাশের এবং তার, যিনি তাকে নির্মাণ করেছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার। এমনিভাবে ما طحها ও ما سوّاها-এর মধ্যেও বুঝতে হবে। সৃষ্টির শপথকে স্রষ্টার শপথের পূর্বে উল্লেখ করার কারণ এরূপ হতে পারে যে, এখানে চিন্তাকে প্রমাণ থেকে দাবীর দিকে স্থানান্তর করা উদ্দেশ্য। স্রষ্টা দাবী এবং সৃষ্টি তার প্রমাণ। সুতরাং এতে তওহীদের দলীল হওয়ারও ইঙ্গিত রয়েছে)। শপথ পৃথিবীর এবং তার যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। শপথ (মানুষের) প্রাণের এবং তার, যিনি একে (সর্বপ্রকার আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা) সুবিন্যস্ত করেছেন, অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের (উভয়ের) জ্ঞানদান করেছেন। (অর্থাৎ অন্তরে যে সৎ কর্ম ও অসৎ কর্মের প্রবণতা সৃষ্টি হয়, তার স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা। অতঃপর অসৎ কর্মী ও সৎ কর্মীর পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে যে) যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয় (অর্থাৎ যে নিজেকে অসৎ কর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখে ও সৎ কর্ম অবলম্বন করে)। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ হয়। (এরপর শপথের জওয়াব উহ্য আছে। অর্থাৎ হে কাফির সম্প্রদায়, তোমরা যখন অসৎ কর্মে লিপ্ত রয়েছ, তখন অবশ্যই গযব ও ধ্বংসে পতিত হবে। পরকালে তো অবশ্যই, দুনিয়াতে মাঝে মাঝে ; যেমন সামূদ গোত্র এই অসৎ কর্মের কারণে আল্লাহ্র গযব ও আযাবে পতিত হয়েছে। তাদের ঘটনা এই ঃ) সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা-বশত (সালেহ্ পয়গম্বরের প্রতি) মিথ্যারোপ করেছিল, (এটা তখনকার ঘটনা) যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি (উষ্ট্রী হত্যায়) তৎপর হয়ে উঠেছিল। (তার সাথে অন্যান্য লোকও শরীক ছিল)। অতঃপর আল্লাহ্র রসূল [সালেহ্ (আ) যখন তাদের হত্যার সংকল্প জানতে পারেন, তখন] তাদেরকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্র উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক (অর্থাৎ উষ্ট্রীকে হত্যা করো না এবং তার পানি বন্ধ করো না। হত্যা সংকল্পের আসল কারণও ছিল পানির পালা, তাই একে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। 'আল্লাহ্র উষ্ট্রী' বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অলৌকিকরূপে একে সৃষ্টি করে নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে কায়েম করেছিলেন এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন জরুরী করে দিয়েছিলেন)।

অতঃপর তারা তাকে (অর্থাৎ নবুয়তের উষ্ট্রীরূপী প্রমাণকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল (কেননা তারা তাঁকে রসূল গণ্য করত না) এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল। অতএব তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে সেই ধ্বংসকে (সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য) ব্যাপক করে দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা (কারও পক্ষ থেকে) এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না (যেমন দুনিয়ার রাজা বাদশাহ্‌রা কোন সম্প্রদায়কে শাস্তি দিলে প্রায়ই ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গণআন্দোলনের আশংকা করে থাকেন। সামূদ সম্প্রদায় ও উষ্ট্রীর বিস্তারিত ঘটনা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরার শুরুতে সাতটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির সাথে তার পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষণ যোগ করা হয়েছে। প্রথম শপথ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا এখানে ضحى শব্দটি অর্থগতভাবে شمس-এর বিশেষণ। অর্থাৎ শপথ সূর্যের যখন তা ঊর্ধ্বগগনে থাকে। সূর্য উদয়ের পর যখন কিছু ঊর্ধ্বে উঠে যায় এবং পৃথিবীতে তার কিরণ ছড়িয়ে পড়ে, সে সময়কে ضحى বলা হয়। তখন সূর্য কাছেই দৃষ্টিগোচর হয় এবং তেমন প্রখরতা না থাকার কারণে তা পূর্ণরূপে দেখাও যায়।

দ্বিতীয় শপথ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا — অর্থাৎ চন্দ্রের শপথ যখন তা সূর্যের পেছনে আসে এবং এর এক অর্থ এই যে, যখন চন্দ্র সূর্যাস্তের পরেই উদিত হয়। মাসের মধ্যভাগে এরূপ হয়। তখন চন্দ্র প্রায় পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। পেছনে আসার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কিছুটা ঊর্ধ্বগগনে থাকার সময় সূর্য যেমন পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি পরিপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে চন্দ্র সূর্যের অনুগামী হয়। তৃতীয় শপথ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا — এখানে جلها-এর সর্বনাম দ্বারা পৃথিবী অথবা দুনিয়াও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ শপথ দিবসের দুনিয়া অথবা পৃথিবীর—যাকে দিন আলোকিত করে। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণরূপে আলোকিত দিবসের শপথ করা হয়েছে। কিন্তু বাক্যের বাহ্যিক অবস্থা এই যে, এখানে সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, শপথ দিবসের, যখন সে সূর্যকে আলোকিত করে। অর্থাৎ যখন দিন শুরু হওয়ার কারণে সূর্য উজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়।

চতুর্থ শপথ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا — অর্থাৎ শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। মানে সূর্যের কিরণকে ঢেকে দেয়।

পঞ্চম শপথ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا—এখানে مَا অব্যয়কে مصدرية ধরে এই অর্থ নেওয়া সুস্পষ্ট যে, সে শপথ আকাশের ও তা নির্মাণের। কোরআনের অন্য এক আয়াতে এর নজির আছে وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰهَا এমনিভাবে ষষ্ঠ শপথ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي বাক্যের অর্থ এরূপ হবে যে, শপথ পৃথিবীর ও তাকে বিস্তৃত করার। এখানে আকাশের সাথে নির্মাণের এবং পৃথিবীর সাথে বিস্তৃত করার উল্লেখও এতদুভয়ের পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর জন্য। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ্ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। কাশশাফ, বায়যাবী ও কুরতুবী একেই পছন্দ করেছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এস্থলে مَا অব্যয়কে مَنْ-এর অর্থে ধরে এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা বুঝিয়েছেন। কাজেই উপরোক্ত বাক্যদ্বয়ের অর্থ হবে শপথ আকাশের ও তাঁর, যিনি একে নির্মাণ করেছেন। শপথ পৃথিবীর ও তাঁর, যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু এখানে সবগুলো শপথই সৃষ্টবস্তুর শপথ। মাঝখানে স্রষ্টার শপথ এসে যাওয়া ধারাবাহিকতার খিলাফ মনে হয়। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ী এ আপত্তিও দেখা দেয় না যে, সৃষ্টবস্তুর শপথ স্রষ্টার শপথের অগ্রে বর্ণিত হল কেন?

সপ্তম শপথ ঃ وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهَا—এখানেও দু'রকম অর্থ হতে পারে---এক. শপথ মানুষের প্রাণের এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার এবং দুই. শপথ নফসের এবং তাঁর, যিনি সেটাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

الهام—فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰهَا-এর অর্থ নিক্ষেপ করা এবং فجور শব্দের অর্থ প্রকাশ্য গোনাহ্। এই বাক্য সপ্তম শপথের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের নফস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর অন্তরে অসৎ কর্ম ও সৎ কর্ম উভয়ের প্রেরণা জাগ্রত করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা গোনাহ্ ও ইবাদত উভয় কর্মের যোগ্যতা রেখেছেন, অতঃপর তাকে বিশেষ এক প্রকার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে সে স্বেচ্ছায় গোনাহের পথ অবলম্বন করে অথবা ইবাদতের পথ। যখন সে নিজ ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন এক পথ অবলম্বন করে, তখন এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার ভিত্তিতেই সে সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হয়। এই তফসীর অনুযায়ী এরূপ প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই যে, মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই যখন পাপ ও ইবাদত নিহিত আছে, তখন সে তা করতে বাধ্য। এর জন্য সে কোন সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হবে না। একটি হাদীস থেকে এই তফসীর গৃহীত হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, তফসীর সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সা) আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্যে গোনাহ্ ও ইবাদতের যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন,

কিন্তু তাকে কোন একটি করতে বাধ্য করেন নি বরং তাকে উভয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি করার ক্ষমতা দান করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন, তখন উচ্চৈস্বরে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِیْ تَقْوٰهَا اَنْتَ وَلِیُّهَا وَمَوْلاَهَا وَاَنْتَ خَیْرُ مَنْ زَكّٰهَا

—অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমাকে তাকওয়ার তওফীক দান কর, তুমিই আমার মুরুব্বী ও পৃষ্টপোষক।

সপ্তম শপথের পর জওয়াবে বলা হয়েছে ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا—অর্থাৎ সে ব্যক্তি সফলকাম, যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করে। تزكية শব্দের প্রকৃত অর্থ অভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করে, সে সফলকাম। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি ব্যর্থ যে নিজের নফসকে পাপের পঙ্কিলে নিমজ্জিত করে দেয়। د س -এর অর্থ মাটিতে প্রোথিত করা; যেমন এক আয়াতে আছে ঃ اَمْ یَدُسُّهٗ فِی التُّرَابِ—কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতের অর্থ করেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম হয় ; যাকে আল্লাহ্ শুদ্ধ করেন এবং সে ব্যক্তি ব্যর্থ, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা গোনাহে ডুবিয়ে দেন। এ আয়াত সমগ্র মানবকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে, সফলকাম ও ব্যর্থ। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার মানুষের একটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করে তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সামূদ গোত্রের ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে তাদের এই শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

فَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰهَا د م د م শব্দ এমন কঠোর শাস্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা বারবার কোন ব্যক্তি অথবা জাতির উপর পতিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে দেয়। سَوّٰهَا-এর উদ্দেশ্য এই যে, এ আযাব জাতির আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সবাইকে বেষ্টন করে নেয়। وَلاَ یَخَافُ عُقْبٰهَا—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তিদান ও কোন জাতিকে নির্মূল করে দেওয়ার ব্যাপারকে দুনিয়ার ব্যাপারের মত মনে করো না। দুনিয়াতে কোন রাজাধিরাজ ও প্রবল পরাক্রান্ত শাসকও কোন জাতির বিরুদ্ধে

ধ্বংসাভিযান পরিচালনা করলে সে জাতির অবশিষ্ট লোক অথবা তাদের সমর্থকদের প্রতিশোধমূলক কার্যক্রম ও গণবিদ্রোহের আশংকা করতে থাকে। এখানে যারা অপরকে হত্যা করে, তারা নিজেরাও হত্যার আশংকা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যারা অপরকে আক্রমণ করে তারা নিজেরাও আক্রান্ত হওয়ার ভয় রাখে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ নন। কারও পক্ষ থেকে কোন সময় তাঁর কোন বিপদাশঙ্কা নেই।

سورة الليل

সূরা লায়ল

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২১ আয়াত ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۝١ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۝٢ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝٣ اِنَّ
سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝٤ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهٗ
لِلْيُسْرٰى ۝٧ وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۝٨ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۝٩ فَسَنُيَسِّرُهٗ
لِلْعُسْرٰى ۝١٠ وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ۝١١ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۝١٢
وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ۝١٣ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۝١٤ لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا
الْاَشْقَى ۝١٥ الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝١٦ وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۝١٧ الَّذِىْ يُؤْتِىْ
مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۝١٨ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ۝١٩ اِلَّا
ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۝٢٠ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ۝٢١

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে, (২) শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয় (৩) এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন, (৪) নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। (৫) অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহ্‌ভীরু হয়, (৬) এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, (৭) আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (৮) আর যে কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় (৯) এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, (১০) আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (১১) যখন সে অধঃপতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না। (১২) আমার দায়িত্ব পথ-প্রদর্শন করা। (১৩) আর আমি মালিক ইহকালের ও পরকালের। (১৪) অতএব,

আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। (১৫) এতে নিতান্ত হত-ভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, (১৬) যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৭) এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তিকে, (১৮) যে আত্মশুদ্ধির জন্যে তার ধন-সম্পদ দান করে (১৯) এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না। (২০) তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত। (২১) সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ রাত্রির যখন সে (সূর্য ও পৃথিবীকে) আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের যখন সে আলোকিত হয় এবং (শপথ) তার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার। অতঃপর জওয়াব এই যে) নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা (অর্থাৎ কর্মসমূহ) বিভিন্ন ধরনের। (এমনিভাবে এসব কর্মের ফলাফলও বিভিন্ন ধরনের)। অতএব, যে (আল্লাহ্‌র পথে ধনসম্পদ) দান করে, আল্লাহ্‌ভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে (অর্থাৎ ইসলামকে) সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। ('সুখের বিষয়' বলে সৎকর্ম ও তার মধ্যস্থতায় জান্নাত বোঝানো হয়েছে। এটাই সহজ পথের কারণ ও স্থান) এবং যে (ওয়াজিব প্রাপ্য দেওয়ার ব্যাপারে) কৃপণতা করে এবং (আল্লাহ্‌কে ভয় করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র প্রতি) বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে (অর্থাৎ ইসলামকে) মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। ('কষ্টের বিষয়' বলে কুকর্ম ও তার মধ্যস্থতায় জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। এটাই কষ্টের কারণ ও স্থান। উভয় জায়গায় সহজ পথ দান করার অর্থ এই যে, ভাল অথবা মন্দ কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং অকপটে প্রকাশ পাবে। হাদীসে এই বিষয়বস্তুর সমর্থন আছে। অতঃপর শেষোক্ত প্রকার লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে) যখন সে অধঃপতিত হবে, তখন তার ধনসম্পদ তার কোন কাজে আসবে না। (অধঃপতিত হওয়ার অর্থ জাহান্নামে যাওয়া)। নিশ্চয় আমার দায়িত্ব (ওয়াদা অনুযায়ী) পথপ্রদর্শন করা। (আমি এই দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছি। এরপর কেউ তো ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করেছে, যা مَنْ أَعْطٰى বাক্যে উল্লিখিত হয়েছে এবং কেউ কুফর ও গোনাহের পথ ধরেছে, যা مَنْ بَخِلَ বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। যে যেমন পথ অবলম্বন করবে, সে তেমনি ফলপ্রাপ্ত হবে। কেননা) আমারই কব্জায় পরকাল ও ইহকাল। (অর্থাৎ উভয় কালে আমারই রাজত্ব। তাই ইহকালে আমি বিধি-বিধান জারি করেছি এবং পরকালে মান্য ও অমান্য করার কারণে প্রতিদান ও শাস্তি দেব। অতঃপর বলা হয়েছে, আমি যে তোমাদেরকে বিভিন্ন কর্মের বিভিন্ন প্রতিফল বলে দিয়েছি, এটা এজন্য যে) আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি, (যা فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى বাক্য জ্ঞাপন করে, যাতে তোমরা ঈমান ও আনুগত্য

অবলম্বন করে এ অগ্নি থেকে আত্মরক্ষা কর এবং কুফর ও গোনাহ্ অবলম্বন করে জাহান্নামে না যাও। অতঃপর তাই বলা হয়েছে---) এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, যে (সত্য ধর্মের প্রতি) মিথ্যারোপ করে এবং (তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহ্ভীরু ব্যক্তিকে, যে (কেবল) আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধনসম্পদ দান করে (অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই যার কাম্য হয়)। এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত (কারণ, এটাই তার লক্ষ্য। এতে আন্তরিকতার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা, কারও অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়াও মোস্তাহাব, উত্তম ও সওয়াবের কাজ। কিন্তু প্রাথমিক অনুগ্রহের সমান শ্রেষ্ঠ নয়। এ ব্যক্তি প্রাথমিক অনুগ্রহ করে। তাই তার দান রিয়া, গোনাহ্ ইত্যাদির আশংকা থেকে উত্তমরূপে মুক্ত হবে। এটাই পরিপূর্ণ আন্তরিকতা)। সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে। (উপরে শুধু বলা হয়েছিল যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, পরকালে তাকে এমন সব নিয়ামত দেওয়া হবে, যাতে সে বাস্তবিকই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا—এ বাক্যটি সূরা ইনশিকাকের إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ বাক্যের অনুরূপ যার তফসীর সে সূরায় বর্ণিত হয়ে গেছে। মর্মার্থ এই যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে কোন না কোন কাজের জন্য প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ে অভ্যস্ত কিন্তু কোন কোন লোক তার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা চিরস্থায়ী সুখের ব্যবস্থা করে নেয়, আর কেউ কেউ এই পরিশ্রম দ্বারাই অনন্ত আযাব ক্রয় করে। হাদীসে আছে, প্রত্যেক মানুষ সকাল বেলায় গাত্রোত্থান করে নিজেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এই ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করে এবং নিজেকে পরকালের আযাব থেকে মুক্ত করে। পক্ষান্তরে কারও শ্রম ও প্রচেষ্টাই তার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হল প্রথমে নিজের প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিণতি চিন্তা করা এবং যে কর্মের পরিণতি সাময়িক সুখ ও আনন্দ হয়, তার কাছেও না যাওয়া।

কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে মানুষের দু'দল ঃ অতঃপর কোরআন পাক কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তিতে মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে এবং প্রত্যেকের তিনটি করে বিশেষণ বর্ণনা করেছে ---প্রথমে সফলকাম দলের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ—অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহ্কে ভয় করে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, তাঁর অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকে এবং সে উত্তম কলেমাকে সত্য মনে করে। এখানে 'উত্তম কলেমা' বলে কলেমায়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'

বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে আব্বাস, যাহ্হাক) এই কলেমাকে সত্য মনে করার অর্থ ঈমান আনা। যদিও ঈমান সব কর্মেরই প্রাণ এবং সবার অগ্রবর্তী বিষয় কিন্তু এখানে পেছনে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে উদ্দেশ্য প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করা। এগুলো কর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। ঈমান হলো একটি অন্তরের বিষয় অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ্ ও রসূলকে সত্য জানা এবং কলেমায়ে শাহাদতের মাধ্যমে মুখেও তা স্বীকার করা। বলাবাহুল্য, এই উভয় কাজে কোন শারীরিক শ্রম নেই এবং কেউ এগুলোকে কর্মের তালিকাভুক্ত গণ্য করে না।

দ্বিতীয় দলেরও তিনটি কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে ঃ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى—অর্থাৎ যে আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা করে তথা যাকাত ও ওয়াজিব সদকাও দেয় না, আল্লাহ্কে ভয় করার পরিবর্তে তাঁর প্রতি বিমুখ হয় এবং উত্তম কলেমা তথা ঈমানের কলেমাকে মিথ্যা মনে করে। এতদুভয়ের প্রথম দল সম্পর্কে বলা হয়েছে فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى—يسرى -এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও আরামদায়ক বিষয়, যাতে কোন কষ্ট নেই। এখানে জান্নাত বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى—عسرى -এর শাব্দিক অর্থ কঠিন ও কষ্টদায়ক বিষয়। এখানে জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রম প্রথমোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, (অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করা, আল্লাহ্কে ভয় করা এবং ঈমানকে সত্য মনে করা) তাদেরকে আমি জান্নাতের কাজের জন্য সহজ করে দেই। পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রমকে শেষোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, আমি তাদেরকে জাহান্নামের কাজের জন্য সহজ করে দেই। এখানে বাহ্যত এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, আমি তাদের জন্য জান্নাতের অথবা জাহান্নামের কাজ সহজ করে দেই। কেননা কাজকর্মই সহজ অথবা কঠিন হয়ে থাকে---ব্যক্তি সহজ অথবা কঠিন হয় না। কিন্তু কোরআন পাক এভাবে ব্যক্ত করেছে যে, স্বয়ং তাদের সত্তাকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রথম দলের জন্য জান্নাতের কাজকর্ম তাদের মজ্জায় পরিণত হবে। আর এর বিপরীত কাজ করতে তারা কষ্ট অনুভব করবে। এমনিভাবে দ্বিতীয় দলের জন্য জাহান্নামের কাজকর্ম মজ্জায় পরিণত করে দেওয়া হবে। ফলে তারা এজাতীয় কাজই পছন্দ করবে এবং এতেই শান্তি পাবে। উভয় দলের মজ্জায় এ অবস্থা সৃষ্টি করে দেওয়াকেই একথা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদেরকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। এক হাদীস এর সমর্থনে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعادة فسنيسر

لعمل السعادة و اما من كان من اهل الشقاوة فسييسر لعمل اهل الشقاوة -

অর্থাৎ তোমরা নিজ নিজ কর্ম করে যাও। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেকাজই সহজ করা হয়েছে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যবানদের কাজই তার স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত হয়। আর যে হতভাগা, হতভাগাদের কাজই তার স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত হয়। এতদুভয় বিষয় আল্লাহ্প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলশ্রুতিতে অর্জিত হয়। তাই একারণে আযাব ও সওবাব দেওয়া হয়। অতঃপর হতভাগ্য জাহান্নামী দলকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে ঃ

وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى—অর্থাৎ যে ধনসম্পদের খাতিরে এ হতভাগ্য ওয়াজিব হক দিতেও কৃপণতা করত, সে ধনসম্পদ আযাব আসার সময় তার কোন কাজে আসবে না। تردى -এর শাব্দিক অর্থ গর্তে পতিত হওয়া ও ধ্বংস হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পরে কবরে অতঃপর কিয়ামতে যখন সে জাহান্নামের গর্তে পতিত হবে, তখন এই ধনসম্পদ কোন উপকারে আসবে না।

لَا يَصْلٰهَآ اِلَّا الْاَشْقَى الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى—অর্থাৎ এই জাহান্নামে নিতান্ত হতভাগা ব্যক্তিই দাখিল হবে, যে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাঁদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলাবাহুল্য, এরূপ মিথ্যা আরোপকারী কাফিরই হতে পারে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, পাপী মু'মিন যে মিথ্যারোপের অপরাধে অপরাধী নয়, সে জাহান্নামে দাখিল হবে না। অথচ কোরআনের অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিন ব্যক্তি গোনাহ্ করার পর যদি তওবা না করে অথবা কারও সুপারিশের বলে কিংবা বিশেষ রহমতে যদি তাকে ক্ষমা করা না হয়, তবে সেও জাহান্নামে যাবে এবং গোনাহের শাস্তি ভোগ করা পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে। অবশ্য শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে ঈমানের কল্যাণে তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের ভাষা বাহ্যত এর পরিপন্থী। অতএব এ আয়াতের অর্থ এমন হওয়া জরুরী, যা অন্যান্য আয়াত ও সহীহ হাদীসের খিলাফ নয়। এর একান্ত সহজ ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে চিরকালের জন্য দাখিল হওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা কাফিরেরই বৈশিষ্ট্য। মু'মিন কোন না কোন সময় গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পাবে। তফসীরবিদগণ এছাড়া আরও কিছু ব্যাখ্যা করেছেন। তফসীরে মাযহারীতে আছে যে, আয়াতে اتقى ও اشقى শব্দদ্বয়ের অর্থ ব্যাপক নয় বরং এখানে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে বিদ্যমান ছিল। তাদের মধ্যে কোন মুসলমান গোনাহ্ করা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সংসর্গের বরকতে জাহান্নামে যাবে না।

সাহাবায়ে কিরাম সবাই জাহান্নাম থেকে মুক্ত ঃ কারণ, প্রথমত তাঁদের দ্বারা গোনাহ্

খুব কমই হয়েছে। তাছাড়া তাঁদের অবস্থা থেকে একথা জরুরীভাবে জানা যায় যে, তাঁদের কারও দ্বারা কোন গোনাহ্ হয়ে থাকলে তিনি তওবা করে নিয়েছেন। আরও বলা যায় যে, তাঁদের এক একটি গোনাহের মুকাবিলায় সৎকর্মের সংখ্যা এত বেশী যে, সে গোনাহ্ অনায়াসেই মাফ হয়ে যেতে পারে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ অর্থাৎ সৎ কর্ম অসৎ কর্মের কাফফরা হয়ে যায়। স্বয়ং রসূলে করীম (সা)-এর সঙ্গও এমন একটি সৎকর্ম, যা সব সৎকর্মের উপর প্রবল। হাদীসে সৎকর্মশীল বুযুর্গদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ هم قوم لا يشقى جليسهم و لا يخاب انيسهم অর্থাৎ তাঁদের সাথে যারা উঠাবসা করে, তারা হতভাগা হতে পারে না এবং তাদের সাথে যারা প্রীতির সম্পর্ক রাখে, তারা বঞ্চিত হতে পারে না।---(বুখারী, মুসলিম) সুতরাং যে ব্যক্তি পয়গম্বরকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)-র সহচর হবে, সে কিরূপে হতভাগ্য হতে পারে? এ কারণেই অনেক সহীহ হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম সবাই জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্ত। খোদ কোরআনে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ---অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হুসনা অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ---অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে হুসনা (জান্নাত) অবধারিত হয়ে গেছে, তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে। এক হাদীসে আছে, জাহান্নামের অগ্নি সে ব্যক্তিকে স্পর্শ করবে না, যে আমাকে দেখেছে।---(তিরমিযী)

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ---এতে সৌভাগ্যশালী আল্লাহ্ভীরুদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্যে অভ্যস্ত এবং একমাত্র গোনাহ্ থেকে শুদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে।

আয়াতের ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তিই ঈমানসহ আল্লাহ্র পথে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। কিন্তু এ আয়াতের শানে-নুযূল সংক্রান্ত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, এখানে اتقى বলে হযরত আবূ বকর

সিদ্দীক (রা)-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত ওরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাতজন মুসলমানকে কাফিররা গোলাম বানিয়ে রেখেছিল এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। হযরত আবূ বকর (রা) বিরাট অংকের অর্থ দিয়ে তাদেরকে কাফির মালিকদের কাছ থেকে ক্রয় করে নেন এবং মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।---(মাযহারী)

এর সাথেই সম্পর্কশীল আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে ঃ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى----অর্থাৎ যেসব গোলামকে হযরত আবূ বকর (রা) প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোন সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরূপ করা যেত; বরং اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى----তাঁর লক্ষ্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না।

মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোন মুসলমানকে কাফির মালিকের হাতে বন্দী দেখলে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন। এ ধরনের মুসলমান সাধারণত দুর্বল ও শক্তি-হীন হত। একদিন তাঁর পিতা হযরত আবূ কোহাফা বললেন ঃ তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তই করে দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহসী গোলাম দেখে মুক্ত করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে সে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে হিফাজত করতে পারে। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন ঃ কোন মুক্ত করা মুসলমান দ্বারা উপকার লাভ করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি তো কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তাদেরকে মুক্ত করি।---(মাযহারী)

وَلَسَوْفَ يَرْضٰى----অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই তার ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং পার্থিব উপকার চায়নি, আল্লাহ্ তা'আলাও পরকালে তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং জান্নাতের মহা নিয়ামত তাকে দান করবেন। এই শেষ বাক্যটি হযরত আবূ বকর (রা)-এর জন্য একটি বিরাট সুসংবাদ। আল্লাহ্ তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন এ সংবাদ দুনিয়াতেই তাঁকে শোনানো হয়েছে।

سورة الضحى

সূরা যোহা

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১১ ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالضُّحٰى ۝١ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝٣ وَ لَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ
مِنَ الْاُوْلٰى ۝٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝٥ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝٦
وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝٧ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۝٨ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا
تَقْهَرْ ۝٩ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ পূর্বাহ্নের, (২) শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, (৩) আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। (৪) আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। (৫) আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (৬) তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। (৭) তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। (৮) তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। (৯) সুতরাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না; (১০) সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না (১১) এবং আপনার পালনকর্তার নিয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ পূর্বাহ্নের এবং রাত্রির যখন তা গভীর হয়, (এর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে--- এক. আক্ষরিক অর্থাৎ পুরোপুরি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া। কেননা, রাত্রিতে অন্ধকার আস্তে আস্তে বাড়ে এবং কিছু রাত্রি অতিবাহিত হলে পর তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দুই. রূপক অর্থাৎ প্রাণীকুলের নিদ্রামগ্ন হয়ে যাওয়া এবং চলাফেরা ও কথাবার্তার আওয়ায থেমে যাওয়া। অতঃপর শপথের জওয়াব বলা হয়েছে) আপনার পালনকর্তা

আপনাকে ত্যাগ করেন নি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হন নি। (কেননা, প্রথমত আপনি এরূপ কোন কাজ করেন নি। দ্বিতীয়ত পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ আচরণ থেকে মুক্ত রেখেছেন। সুতরাং আপনি কাফিরদের বাজে কথায় ব্যথিত হবেন না। ওহীর আগমনে কয়েকদিন বিলম্ব দেখে তারা বলতে শুরু করেছে ঃ আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেছেন। কাফিরদের এই প্রলাপোক্তির মুকাবিলায় আপনি পূর্ববৎ ওহীর সম্মান দ্বারা ভূষিত হবেন। এ সম্মান তো আপনার জন্য ইহকালে) আপনার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। (সুতরাং সেখানে আপনি আরও বেশী সম্মান ও নিয়ামত পাবেন)। আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে (পরকালে প্রচুর নিয়ামত) দান করবেন, অতঃপর আপনি (এ দান পেয়ে) সন্তুষ্ট হবেন। [শপথের বিষয়বস্তুর সাথে এ সুসংবাদের সম্পর্ক এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেমন বাহ্যত দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন এনে তাঁর কুদরত ও হিকমতের বিভিন্ন নিদর্শন প্রকাশ করেন, অভ্যন্তরীণ অবস্থাকেও তেমনি বুঝতে হবে। সূর্য-কিরণের পর রাত্রির আগমন যদি আল্লাহ্ তা'আলার রোষ ও অসন্তুষ্টির দলীল না হয় এবং এতে প্রমাণিত না হয় যে, এরপর কখনও দিবালোক আসবে না, তবে কয়েক দিন ওহীর আগমন বন্ধ থাকলে এটা কিরূপে বোঝা যায় যে, আজকাল আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত পয়গম্বরের প্রতি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। ফলে ওহীর দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন? এরূপ বলার অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞান ও অপার রহস্য সম্পর্কে আপত্তি তোলা যে, তিনি পূর্বে জানতেন না তাঁর মনোনীত পয়গম্বর ভবিষ্যতে অযোগ্য প্রমাণিত হবে (নাউযু-বিল্লাহ্)। অতঃপর কতক নিয়ামত দ্বারা উপরোক্ত বিষয়বস্তুকে জোরদার করা হয়েছে]। আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে ইয়াতীমরূপে পান নি? অতঃপর আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন। [মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই রসূলুল্লাহ্ (সা) পিতৃহীন হয়ে যান। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা দাদাকে দিয়ে তাঁর লালন-পালন করান। আট বছর বয়সে মাতারও ইন্তেকাল হয়ে গেলে তিনি পিতৃব্যের লালন-পালনে আসেন। আশ্রয় দেওয়ার অর্থ এটাই]। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে (শরীয়ত সম্পর্কে) বেখবর পান, অতঃপর (শরীয়তের) পথপ্রদর্শন করেছেন।

(যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ —ওহীর পূর্বে শরীয়তের তফসীল জানা না থাকা কোন দোষ নয়)। তিনি আপনাকে নিঃস্ব পেয়েছেন অতঃপর ধনশালী করেছেন। [খাদীজা (রা)-র অর্থ দ্বারা তিনি অংশীদারিত্বে ব্যবসা করেন এবং মুনাফা অর্জন করেন। অতঃপর খাদীজা (রা) তাঁর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁর হাতে তুলে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি শুরু থেকেই নিয়ামত-প্রাপ্ত আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। আমি যখন এসব নিয়ামত আপনাকে দিয়েছি, তখন] আপনি (এর কৃতজ্ঞতায়) ইয়াতীমের প্রতি কঠোরতা করবেন না, সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দেবন না (এটা কার্যগত কৃতজ্ঞতা।) এবং আপনার পালনকর্তার (উপরোক্ত) নিয়ামতের কথা প্রকাশ করতে থাকুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরা অবতরণের কারণ সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত জুনদুব ইবনে অবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি অংগুলীতে আঘাত লেগে রক্ত বের হয়ে পড়লে বললেন ঃ

ان انت الا اصبع دميت
وفى سبيل الله لقيت

অর্থাৎ তুমি তো একটি অংগুলিই যা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তুমি যে কষ্ট পেয়েছ, তা আল্লাহ্র পথেই পেয়েছ। (কাজেই দুঃখ কিসের)। এ ঘটনার পর কিছু দিন জিবরাঈল ওহী নিয়ে আগমন করলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ্ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে এই সূরা যোহা অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে বর্ণিত জুনদুব (রা)-এর রেওয়ায়েতে দু'এক রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য না উঠার কথা আছে---ওহী বিলম্বিত হওয়ার কথা নেই। তিরমিযীতে তাহাজ্জুদের জন্য না উঠার উল্লেখ নেই, শুধু ওহী বিলম্বিত হওয়ার উল্লেখ আছে। বলাবাহুল্য, উভয় ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে বিধায় উভয় রেওয়ায়েতে কোন বিরোধ নেই। বর্ণনাকারী হয় তো এক সময়ে এক ঘটনা এবং অন্য সময়ে অন্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রেওয়ায়েতে আছে যে, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালিয়েছিল। ওহী বিলম্বিত হওয়ার ঘটনা কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল। একবার কোরআন অবতরণের প্রথমভাগে, যাকে 'ফাতরাতে-ওহী'র কাল বলা হয়। এটাই ছিল বেশী দিনের বিলম্ব। দ্বিতীয়বার তখন বিলম্বিত হয়েছিল, যখন মুশরিকরা অথবা ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে রূহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখেছিল এবং তিনি পরে জওয়াব দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন 'ইনশাআল্লাহ্' না বলার কারণে ওহীর আগমন বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল যে, মুহাম্মদের আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছেন। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা যোহা অবতীর্ণ হয়, সেটাও এমনি ধরনের। সবগুলো ঘটনা একই সময়ে সংঘটিত হওয়া জরুরী নয় বরং আগে-পিছেও হতে পারে।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى---এখানে اولى ও اخرة শব্দদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অর্থ পরকাল ও ইহকাল নেওয়া হলে এর ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা আপনার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, এর অসারতা তো তারা ইহকালে দেখে নিবেই, অধিকন্তু আমি আপনাকে পরকালে নিয়ামত দান করারও ওয়াদা দিচ্ছি। সেখানে আপনাকে ইহকাল অপেক্ষা অনেক বেশী নিয়ামত দান করা হবে। এখানে اخرة কে শাব্দিক অর্থে নেওয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, এর অর্থ পরবর্তী অবস্থা ; যেমন اولى শব্দের অর্থ প্রথম অবস্থা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনার প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত দিন দিন বেড়েই যাবে এবং প্রত্যেক প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উত্তম ও শ্রেয় হবে। এতে

জ্ঞানগরিমা ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যে উন্নতিলাভসহ জীবিকা এবং পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব অবস্থাই অন্তর্ভুক্ত।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ—অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা আপনাকে এত প্রাচুর্য দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এতে কি দেবেন, তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কাম্যবস্তুই প্রচুর পরিমাণে দেবেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাম্যবস্তুসমূহের মধ্যে ছিল ইসলামের উন্নতি, সারা বিশ্বে ইসলামের প্রসার, উম্মতের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়লাভ, শত্রুদেশে ইসলামের কলেমা সমুন্নত করা ইত্যাদি। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাযিল হলে পর রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তাহলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার উম্মতের একটি লোকও জাহান্নামে থাকবে।---(কুরতুবী) হযরত আলী (রা) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মত সম্পর্কে আমার সুপারিশ কবূল করবেন এবং অবশেষে তিনি বলবেন ঃ رضيت يا محمد হে মুহাম্মদ, এখন আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কি ? আমি আরয করব ঃ يارب رضيت হে আমার পরওয়ারদিগার, আমি সন্তুষ্ট। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কিত এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ--- অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-র উক্তি সম্বলিত অপর একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ--এরপর তিনি দু'হাত তুলে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বারবার বলতে লাগলেন ঃ اللهم امتى امتى আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈলকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করতে প্রেরণ করলেন ঃ (এবং বললেন, অবশ্য আমি সব জানি)। জিবরাঈলের জওয়াবে তিনি বললেন ঃ আমি আমার উম্মতের মাগফিরাত চাই। আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈলকে বললেন ঃ যাও, গিয়ে বল যে, আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং আপনাকে দুঃখিত করবেন না।

উপরে কাফিরদের বলাবলির জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্‌র নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল। অতঃপর তিনটি বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করে এর কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হয়েছে ঃ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ—এটা প্রথম নিয়ামত।

অর্থাৎ আমি আপনাকে পিতৃহীন পেয়েছি। আপনার জন্মের পূর্বেই পিতা ইন্তেকাল করেছিল। পিতা কোন বিষয়-আশয়ও ছেড়ে যায়নি, যদ্দ্বারা আপনার লালন-পালন হতে পারত। অতঃপর আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। অর্থাৎ প্রথমে পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের ও পরে পিতৃব্য আবূ তালিবের অন্তরে আপনার প্রতি অগাধ ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছি। ফলে তারা ঔরসজাত সন্তান অপেক্ষা অধিক যত্নসহকারে আপনাকে লালন-পালন করত।

দ্বিতীয় নিয়ামত ঃ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى—ضال শব্দের অর্থ পথভ্রষ্টও হয় এবং অনভিজ্ঞ, বেখবরও হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। নবুয়ত লাভের পূর্বে তিনি আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। অতঃপর নবুয়তের পদ দান করে তাঁকে পথনির্দেশ দেওয়া হয়।

তৃতীয় নিয়ামত ঃ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنٰى—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত পেয়েছেন। অতঃপর আপনাকে ধনশালী করেছেন। হযরত খাদীজা (রা)-র ধনসম্পদ দ্বারা অংশীদারী কারবার করার মাধ্যমে এর সূচনা হয়, অতঃপর খাদীজা (রা)-কে বিবাহ করার ফলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য উৎসর্গিত হয়ে যায়।

এ তিনটি নিয়ামত উল্লেখ করার পর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ—قهر শব্দের অর্থ জবরদস্তিমূলক-ভাবে অধিকারভুক্ত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কোন পিতৃহীনকে অসহায় ও বেওয়ারিশ মনে করে তার ধনসম্পদ জবরদস্তিমূলকভাবে নিজ অধিকারভুক্ত করে নেবেন না। একারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াতীমের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর আদেশ দিয়েছেন এবং বেদনাদায়ক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মুসলমানদের সে গৃহই সর্বোত্তম যাতে কোন ইয়াতীম রয়েছে এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করা হয়। আর সে গৃহ সর্বাধিক মন্দ, যাতে কোন ইয়াতীম রয়েছে কিন্তু তার সাথে অসদ্ব্যবহার করা হয়।—(মাযহারী)

দ্বিতীয় নির্দেশ ঃ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ—نهر শব্দের অর্থ ধমক দেওয়া এবং سائل-এর অর্থ সাহায্যপ্রার্থী। অর্থগত ও জ্ঞানগত উভয় প্রকার সাহায্যপ্রার্থী এর অন্তর্ভুক্ত। উভয়কে ধমক দিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিষেধ করা হয়েছে। সাহায্যপ্রার্থীকে কিছু দিয়ে বিদায় করা এবং দিতে না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উত্তম। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন শিক্ষণীয় বিষয় জানতে চায় তার জওয়াবেও কঠোরতা ও দুর্ব্যবহার করা নিষেধ। তবে যদি কোন সাহায্যপ্রার্থী নাছোড়বান্দা হয়ে যায় তবে প্রয়োজনে তাকে ধমক দেওয়াও জায়েয।

তৃতীয় নির্দেশ ঃ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ—وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ শব্দের অর্থ কথা বলা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের সামনে আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করুন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটাও এক পন্থা। এমনকি একজন অন্যজনের প্রতি যে অনুগ্রহ করে, তারও শোকর আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহ্ তা'আলারও শোকর আদায় করে না।---(মাযহারী)

এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে তোমারও উচিত তার অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়া। যদি আর্থিক প্রতিদান দিতে অক্ষম হও, তবে মানুষের সামনে তার প্রশংসা কর। কেননা, যে জনসমক্ষে তার প্রশংসা করে, সে কৃতজ্ঞতার হক আদায় করে দেয়।---(মাযহারী)

মাস'আলা ঃ সবরকম নিয়ামতের শোকর আদায় করাই ওয়াজিব। আর্থিক নিয়ামতের শোকর হল তা থেকে কিছু খাঁটি নিয়তে ব্যয় করা। শারীরিক নিয়ামতের শোকর হল শারীরিক শক্তিকে আল্লাহ্‌র ফরয কার্য সম্পাদনে ব্যয় করা। জ্ঞানগত নিয়ামতের শোকর হল অপরকে তা শিক্ষা দেওয়া।---(মাযহারী) .

o সূরা যোহা থেকে কোরআনের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার সাথে তকবীর বলা সুন্নত। শায়েখ সালেহ মিসরীর মতে এই তকবীর হল ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

---(মাযহারী)

ইবনে কাসীর প্রত্যেক সূরা শেষে এবং বগভী (র) প্রত্যেক সূরার শুরুতে তকবীর বলা সুন্নত বলেছেন।---(মাযহারী) উভয়ের মধ্যে যাই করা হবে, তাতে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

সূরা যোহা থেকে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং কয়েকটি সূরায় কিয়ামত ও তার অবস্থাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন মহান এবং যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। এই বিষয়বস্তু দ্বারাই কোরআন পাক শুরু করা হয়েছে এবং সেই সত্তার মাহাত্ম্য বর্ণনা দ্বারা শেষ করা হয়েছে, যাঁর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

سورة الانشراح

সূরা ইনশিরাহ্

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৮ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ
ظَهْرَكَ ۝٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
يُسْرًا ۝٦ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি? (২) আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, (৩) যা ছিল আপনার জন্য অতিশয় দুঃসহ। (৪) আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি। (৫) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৬) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৭) অতএব, যখন অবসর পান, পরিশ্রম করুন। (৮) এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

তফসীরের সারে-সংক্ষেপ

আমি কি আপনার খাতিরে আপনার বক্ষ (জ্ঞান ও সহিষ্ণুতা দ্বারা) প্রশস্ত করে দেইনি? (অর্থাৎ জ্ঞান ও বিস্তৃতি দান করেছি এবং প্রচারকার্যে শত্রুদের বাধা দানের কারণে যে কষ্ট হয়, তা সহ্য করার ক্ষমতাও দিয়েছি।---দুরের-মনসূর) আমি আপনার বোঝা লাঘব করেছি, যা আপনার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল। ['বোঝা' বলে এখানে সেসব বৈধ বিষয় বোঝানো হয়েছে, যা কোন কোন সময় রহস্য ও উপযোগিতাবশত রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পাদন করতেন এবং পরে প্রমাণিত হত যে, এটা উপযোগিতা ও উত্তম নীতির বিরোধী। এতে তিনি উচ্চমর্যাদা ও চরম নৈকট্যের কারণে এমন চিন্তিত হতেন, যেন কোন গোনাহ্ করে ফেলেছেন! আয়াতে এ জাতীয় কাজের জন্য তাঁকে পাকড়াও করা হবে না বলে সুসংবাদ রয়েছে। এরূপ সুসংবাদ তাঁকে দু'বার দেওয়া হয়েছে---একবার মক্কায় এই সূরার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়বার মদীনায় সূরা ফাত্‌হের মাধ্যমে। এতে প্রথম সুসংবাদের তাকীদ নবায়ন

ও তফসীল করা হয়েছে]। আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চে স্থাপন করেছি। (অর্থাৎ শরীয়তের অধিকাংশ জায়গায় আল্লাহ্‌র নামের সাথে আপনার নাম যুক্ত হয়েছে। এক হাদীসে-কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন ঃ اذا ذكرت ذكرت معى অর্থাৎ যেখানে আমার আলোচনা হবে, সেখানে আমার সাথে আপনার আলোচনাও হবে। যেমন, খোতবায়, তাশাহ্‌হুদে, আযানে ও ইকামতে। আল্লাহ্‌র নামের উচ্চতা ও খ্যাতি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। সুতরাং আল্লাহ্‌র নামের সাথে যুক্ত নামও উচ্চ ও সুখ্যাত হবে। মক্কায় তিনি ও মু'মিনগণ নানারকম কষ্ট ও বিপদাপদে গ্রেফতার ছিলেন। তাই অতঃপর সেসব কষ্ট দূর করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, আমি যখন আপনাকে আত্মিক সুখ দিয়েছি এবং আত্মিক কষ্ট দূর করে দিয়েছি, তখন পার্থিব সুখ ও শ্রমের ব্যাপারেও আমার দয়া এবং অনুগ্রহের আশা করা উচিত। সেমতে আমি ওয়াদা করছি) নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সাথে (অর্থাৎ সত্বরই) স্বস্তি হবে। (এসব বিপদাপদের প্রকার ও সংখ্যা অনেক ছিল। তাই তাকীদের জন্য পুনশ্চ ওয়াদা করা হচ্ছে) নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সাথে স্বস্তি হবে। (সেমতে সব বিপদাপদ এক এক করে দূর হয়ে যায়। অতঃপর এসব নিয়ামতের কারণে শোকর আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে---আমি যখন এসব নিয়ামত দিলাম, তখন) আপনি যখন (প্রচারকার্য থেকে) অবসর পাবেন, তখন (আপনার বিশেষ বিশেষ ইবাদতে) পরিশ্রম করুন (অর্থাৎ অধিক ইবাদত ও সাধনা করুন। এটাই আপনার শানের উপযুক্ত) এবং (যা কিছু চাইতে হয়, সে ব্যাপারে) আপনার পালনকর্তার দিকে মনোনিবেশ করুন। (অর্থাৎ তাঁর কাছেই চান। এতেও কষ্ট দূর করার এক ধরনের সুসংবাদ রয়েছে। কেননা, আবেদন করার নির্দেশ দান প্রকারান্তরে আবেদন পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা যোহার শেষে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা যোহা থেকে শেষ পর্যন্ত বাইশটি সূরায় বেশীর ভাগ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি নিয়ামত ও তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মাত্র কয়েকটি সূরায় কিয়ামতের অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য সূরা ইন্‌শিরাহেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে এবং এ বর্ণনায়ও সূরা যোহার ন্যায় জিজ্ঞাসাবোধক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে।

شرح—اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা। জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্য বক্ষকে প্রশস্ত করে দেওয়ার অর্থে বক্ষ উন্মুক্ত করা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র বক্ষকে আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞান-তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্য এমন বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন যে, বড় বড় পণ্ডিত-দার্শনিকও তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারে

কাছে পৌঁছতে পারেনি। এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টির প্রতি তাঁর মনোনিবেশ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মনোনিবেশে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করত না। কোন কোন সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, ফিরিশতাগণ আল্লাহ্র আদেশে বাহ্যত ও তাঁর বক্ষ বিদারণ করে পরিষ্কার করেছিল। কোন কোন তফসীরবিদ এস্থলে বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ সে বক্ষ বিদারণই নিয়েছেন। ---(ইবনে কাসীর)

وزر—وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِيْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ -এর শাব্দিক অর্থ বোঝা আর نقض ظهر -এর শাব্দিক অর্থ কোমর ভেঙ্গে দেওয়া। অর্থাৎ কোমরকে নুইয়ে দেওয়া। কোন বড় বোঝা কারও মাথায় তুলে দিলে যেমন তার কোমর নুয়ে পড়ে, তেমনি আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে বোঝা আপনার কোমরকে নুইয়ে দিয়েছিল, আমি তাকে আপনার উপর থেকে অপসারিত করে দিয়েছি। সে বোঝা কি ছিল, তার এক ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, এতে সে বৈধ ও অনুমোদিত কাজ বোঝানো হয়েছে, যা কোন কোন সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) তাৎপর্য ও উপযোগিতাবশত সম্পাদন করেছেন কিন্তু পরে জানা গেছে যে, কাজটি উপযোগিতা ও উত্তম নীতির বিরোধী ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে ছিল এবং তিনি আল্লাহ্র নৈকট্যের বিশেষ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই এ ধরনের কাজের জন্যও তিনি অতিশয় চিন্তিত, দুঃখিত ও ব্যথিত হতেন। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে সুসংবাদ শুনিয়ে সে বোঝা তাঁর উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ ধরনের কাজের জন্য আপনাকে পাকড়াও করা হবে না।

কোন কোন তফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে বোঝার অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, নবুয়তের প্রথমদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর ওহীর প্রতিক্রিয়াও গুরুতররূপে দেখা দিত। তদুপরি সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার করা এবং কুফর ও শিরকের বিলোপ সাধন করে সমগ্র মানব জাতিকে তওহীদে একত্রিত করার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। এসব ব্যাপারে আদেশ ছিল ঃ فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ ---অর্থাৎ আপনি আল্লাহ্র আদেশ অনুযায়ী সরলপথে অটল থাকুন। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই গুরুভার তিলে তিলে অনুভব করতেন। এক হাদীসে আছে, তাঁর দাড়ির কতক চুল সাদা হয়ে গেলে তিনি বললেন ঃ فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ— এই আয়াত আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।

এই বোঝাকেই তাঁর অন্তর থেকে সরিয়ে দেওয়ার সুসংবাদ এ আয়াতে উক্ত হয়েছে। একে সরানোর পন্থা পরের আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আপনার প্রত্যেক কষ্টের পর স্বস্তি আসবে। আল্লাহ্ তা'আলা বক্ষ উন্মুক্ত করার মাধ্যমে তাঁর মনোবল আকাশচুম্বী করে দেন। ফলে প্রত্যেক কঠিন কাজই তাঁর কাছে সহজ মনে হতে থাকে এবং কোন বোঝাই আর বোঝা থাকেনি।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ——রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আলোচনা উন্নত করা এই যে, ইসলামের বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মসমূহে আল্লাহর নামের সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়। সারা বিশ্বের মসজিদসমূহের মিনারে ও মিম্বরে 'আশহাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহহ্'র সাথে সাথে 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্' বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশ্বের কোন জ্ঞানী মানুষ তাঁর নাম সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত উচ্চারণ করে না, যদিও সে অমুসলমান হয়।

এখানে তিনটি নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে——شرح صدر (বক্ষ উন্মোচন) وضع وزر (বোঝা লাঘবকরণ) ও رفع ذكر (আলোচনা উন্নতকরণ)। এগুলোকে তিনটি বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বাক্যে কর্তা ও কর্মের মাঝখানে لك অথবা عنك ব্যবহার করা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব কাজ আপনার খাতিরেই করা হয়েছে।

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا——আরবী ভাষার একটি নীতি এই যে, আলিফ ও লাম যুক্ত শব্দকে যদি পুনরায় আলিফ ও লাম সহকারে উল্লেখ করা হয়, তবে উভয় জায়গায় একই বস্তুসত্তা অর্থ হয়ে থাকে এবং আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে পুনরায় উল্লেখ করা হলে উভয় জায়গায় পৃথক পৃথক বস্তুসত্তা বোঝানো হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে العسر শব্দটি যখন পুনরায় العسر উল্লিখিত হয়েছে, তখন বোঝা গেল যে, উভয় জায়গায় একই عسر অর্থাৎ কষ্ট বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে يسرا শব্দটি উভয় জায়গায় আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে উল্লিখিত হয়েছে। এতে নিয়মানুযায়ী বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় يسر তথা স্বস্তি প্রথম يسر তথা স্বস্তি থেকে ভিন্ন। অতএব আয়াতে إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا—এর পুনরুল্লেখ থেকে জানা গেল যে, একই কষ্টের জন্য দু'টি স্বস্তির ওয়াদা করা হয়েছে। দু'-এর উদ্দেশ্যও ঐখানে বিশেষ দু'-এর সংখ্যা নয়; বরং উদ্দেশ্য অনেক। অতএব সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি কষ্টের সাথে তাঁকে অনেক স্বস্তিদান করা হবে।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেনঃ আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে এই আয়াত থেকে দু'টি সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং বলেছেন, لن يغلب عسر يسرين অর্থাৎ এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর প্রবল হতে পারে না। সেমতে মুসলমান ও অমুসলমানদের লিখিত সব ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, যে কাজ কঠিন থেকে কঠিনতর বরং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হত, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য সে কাজ সহজতর হয়ে গিয়েছিল।

শিক্ষা ও প্রচারকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য একান্তে যিকর ও আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করা জরুরী ঃ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

অর্থাৎ আপনি যখন দাওয়াত ও তবলীগের কাজ থেকে অবসর পান, তখন অন্য কাজের জন্য তৈরী হয়ে যান। আর তা হল এই যে, আল্লাহ্‌র যিকর, দোয়া ও ইস্তেগফারে আত্মনিয়োগ করুন। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ তফসীরই করেছেন। কেউ কেউ অন্য তফসীরও করেছেন কিন্তু এটাই অধিকতর বোধগম্য তফসীর। এর সারমর্ম এই যে, দাওয়াত, তবলীগ, মানুষকে পথপ্রদর্শন করা এবং তাদের সংশোধনের চিন্তা করা—এসবই ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সর্ববৃহৎ ইবাদত। কিন্তু এটা সৃষ্টজীবের মধ্যস্থতায় ইবাদত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কেবল এজাতীয় পরোক্ষ ইবাদত করে ক্ষান্ত হবেন না বরং যখনই এ ইবাদত থেকে অবসর পাবেন, তখন একান্তে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করুন। তাঁর কাছেই প্রত্যেক কাজে সাফল্য লাভের দোয়া করুন। আল্লাহ্‌র যিকর ও প্রত্যক্ষ ইবাদতই তো আসল উদ্দেশ্য। এর জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই পরোক্ষ ইবাদত থেকে অবসর পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা এক প্রয়োজনের ইবাদত। এ থেকে অবসর পাওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রত্যক্ষ ইবাদত তথা আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করা এমন বিষয়, যা থেকে মু'মিন ব্যক্তি কখনও অবসর পেতে পারে না, বরং তার জীবন ও সর্বশক্তি এতে ব্যয় করতে হবে।

এ থেকে জানা গেল যে, আলিম সমাজ, যার শিক্ষা, প্রচার ও জনসংশোধনের কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদের কিছু সময় আল্লাহ্‌র যিকর ও আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশে ব্যয়িত হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলিমগণ এরূপই ছিলেন। এছাড়া শিক্ষা এবং প্রচারকার্যও কার্যকর হয় না এবং তাতে বরকতও হয় না। فَانْصَبْ শব্দটি نصب থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ পরিশ্রম ও ক্লান্তি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদত ও যিকর এতটুকু করা উচিত যে, তাতে কিছু কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভূত হয়—আরাম পর্যন্তই সীমিত রাখা উচিত নয়। কোন ওযিফা কিংবা নিয়ম মেনে চলাও এক প্রকার কষ্ট ও ক্লান্তি, যদিও কাজ সামান্যই হয়।

سورة التين

সূরা তীন

মক্কায় অবতীর্ণঃ ৮ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝٣ لَقَدْ
خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥
اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦ فَمَا
يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ আঞ্জীর ফল (তথা ডুমুর) ও যয়তূনের, (২) এবং তূরে সিনীনের (৩) এবং এই নিরাপদ নগরীর। (৪) আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে (৫) অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে (৬) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (৭) অতঃপর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ কিয়ামতকে ? (৮) আল্লাহ্‌ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) বৃক্ষের, যয়তূন বৃক্ষের, তূরে সিনীনের এবং এই নিরাপদ নগরীর (অর্থাৎ মক্কা মোয়াযযমার)। আমি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর (তাদের মধ্যে যে লোক বৃদ্ধ হয়ে যায়) তাকে হীনতাগ্রস্তদের মধ্যে হীনতর করে দেই। (অর্থাৎ সৌন্দর্য কদাকারে এবং শক্তি দৌর্বল্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়)। ফলে সে হীন থেকে হীনতর হয়ে যায়। (এতে পূর্ণ মন্দতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এর ফলে আল্লাহ্‌ যে তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম, তাই ফুটে উঠে। অন্য এক আয়াতে আছে اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ——আল্লাহ্‌ তা'আলা পুনরায় সৃষ্টি করতে ও জীবিত করতে সক্ষম—একথা সপ্রমাণ করাই এ সূরার উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ -বাক্যে এরই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের ব্যাপকতা থেকে জানা যায় যে, সব বৃদ্ধই বিশ্রী ও হীন হয়ে যায়। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য অতঃপর আয়াতে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। (এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মু'মিন সৎকর্ম বৃদ্ধ ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও পরিণতির দিক দিয়ে ভাল অবস্থায়ই থাকে, বরং তাদের ইযযত পূর্বাপেক্ষা বেড়ে যায়। অতঃপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ যখন সৃষ্টি করতে ও অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম, তখন হে মানুষ) অতঃপর কিসে তোমাকে কিয়ামতে অবিশ্বাসী করে? (অর্থাৎ কোন্ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে তুমি কিয়ামতকে মিথ্যা মনে কর?) আল্লাহ্ তা'আলা কি সব বিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন? (পার্থিব কাজকারবারে ও তন্মধ্যে মানবসৃষ্টি ও বার্ধক্যে তার মধ্যে পরিবর্তন আনার কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে এবং পারলৌকিক ব্যাপারাদিতেও ---তন্মধ্যে কিয়ামত ও দান-প্রতিদান অন্যতম)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ----এ সূরায় চারটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। এক. তীন অর্থাৎ আঞ্জীর তথা ডুমুর বৃক্ষ। দুই. যয়তূন বৃক্ষ। তিন. তূরে সিনীন। চার. মক্কা মোকাররমা। এই বিশেষ শপথের কারণ এই হতে পারে যে, তূর পর্বত ও মক্কা নগরীর ন্যায় ডুমুর ও যয়তূন বৃক্ষও বহুল উপকারী। এটাও সম্ভবপর যে, এখানে তীন ও যয়তূন উল্লেখ করে সে স্থান বোঝানো হয়েছে, যেখানে এ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন হয়। আর সে স্থান হচ্ছে শাম দেশ, যা পয়গম্বরগণের আবাসভূমি। হযরত ইবরাহীম (আ)ও সে দেশে অবস্থান করতেন। তাঁকে সেখান থেকে হিজরত করিয়ে মক্কা মোকাররমায় আনা হয়েছিল। এভাবে উপরোক্ত শপথসমূহে সেসব পবিত্র ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেখানে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরগণ জন্মগ্রহণ করেছেন ও প্রেরিত হয়েছেন। শাম দেশ অধিকাংশ পয়গম্বরের আবাসভূমি। তূর পর্বত মূসা (আ)-র আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপের স্থান। সিনীন অথবা সীনা তূর পর্বতের অবস্থানস্থলের নাম। নিরাপদ শহর শেষ নবী (সা)-এর জন্মস্থান ও বাসস্থান।

শপথের পর বলা হয়েছে ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

تقويم-এর শাব্দিক অর্থ কোন কিছুর অবয়ব ও ভিত্তিকে ঠিক করা।

احسن تقويم-এর উদ্দেশ্য এই যে, তার মজ্জা ও স্বভাবকেও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের তুলনায় উত্তম করা হয়েছে এবং তার দৈহিক অবয়ব এবং আকার-আকৃতিকেও দুনিয়ার সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করা হয়েছে।

সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর ঃ মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করেছেন। ইবনে আরাবী বলেন ঃ আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ অপেক্ষা সুন্দর কেউ নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জ্ঞানী, শক্তিমান, বক্তা, শ্রোতা, দ্রষ্টা, কুশলী এবং প্রজ্ঞাবান করেছেন। এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী। সেমতে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে ঃ ان الله خلق ادم على صورته অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে নিজের আকারে সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ এটাই হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কতিপয় গুণাবলী কোন কোন পর্যায়ে তাকেও দেওয়া হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্ তা'আলার কোন আকার নেই।---(কুরতুবী)

মানব সৌন্দর্যের একটি অভাবনীয় ঘটনা ঃ কুরতুবী এস্থলে বর্ণনা করেন, ঈসা ইবনে মূসা হাশেমী খলীফা আবূ জা'ফর মনসূরের একজন বিশেষ সভাসদ ছিলেন। তিনি স্ত্রীকে অত্যধিক ভালবাসতেন। একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে স্ত্রীর সাথে বসে হাসি তামাশার ছলে বলে ফেললেন ঃ انت طالق ثلاثا ان لم تكونى احسن من القمر অর্থাৎ তুমি তিন তালাক, যদি তুমি চাঁদ অপেক্ষা অধিক সুন্দরী না হও। একথা বলতেই স্ত্রী উঠে পর্দায় চলে গেল এবং বলল ঃ আপনি আমাকে তালাক দিয়েছেন। ব্যাপারটি যদিও হাসি তামাশার ছিল কিন্তু বিধান এই যে, পরিষ্কার তালাক শব্দ হাসি তামাশার ছলে উচ্চারণ করলেও তালাক হয়ে যায়। ঈসা ইবনে মূসা চরম অস্থিরতার মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত করলেন। প্রত্যূষে খলীফা আবূ জা'ফর মনসূরের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। খলীফা শহরের ফতওয়াবিদ আলিমগণকে ডেকে মাস'আলা জিজ্ঞেস করলেন। সবাই এক উত্তর দিলেন যে, তালাক হয়ে গেছে। কেননা, তাদের মতে চন্দ্র অপেক্ষা সুন্দর হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপরই নয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার জনৈক শিষ্য আলিম চুপচাপ বসে ছিলেন। খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নিশ্চুপ কেন? তখন তিনি বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম পাঠ করে আলোচ্য সূরা তীন তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন ঃ আমিরুল মু'মিনীন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষ মাত্রেরই অবয়ব সুন্দরতম। কোন কিছুই মানুষ অপেক্ষা সুন্দর নয়। একথা শুনে উপস্থিত আলিমগণ বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন এবং কেউ বিরোধিতা করলেন না। সেমতে খলীফা তালাক হয়নি বলে রায় দিয়ে দিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর---রূপ ও সৌন্দর্যের দিক দিয়েও এবং শারীরিক গড়নের দিক দিয়েও। তার মস্তকে কেমন অঙ্গ কি কি আশ্চর্যজনক কাজ করছে---মনে হয় যেন একটি ফ্যাক্টরী, যাতে নাযুক, সূক্ষ্ম ও সয়ংক্রিয় মেশিন চালু রয়েছে। তার বক্ষ ও পেটের অবস্থাও তদ্রূপ। তার হস্তপদের গঠন ও আকার হাজারো উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। এ কারণেই দার্শনিকগণ বলেন ঃ মানুষ একটি ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ সমগ্র জগতের একটি মডেল। সমগ্র জগতে যেসব বস্তু ছড়িয়ে আছে, তা সবই মানুষের মধ্যে সমবেত আছে।---(কুরতুবী)

সূফী বুযুর্গগণও এ বিষয়ের সমর্থন করেছেন এবং কেউ কেউ মানুষের আপাদমস্তক বিশ্লেষণ করে তাতে জগতের সব বস্তুর নমুনা দেখিয়েছেন।

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ——পূর্বের আয়াতে মানুষকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সুন্দরতম সৃষ্টি করার বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে তার বিপরীতে বলা হয়েছে যে, সে যৌবনের প্রারম্ভে যেমন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ছিল, তেমনি পরিশেষে সে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর এবং মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এই উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা তার বাহ্যিক ও শারীরিক অবস্থার দিক দিয়ে বলা হয়েছে। যৌবন অস্তমিত হয়ে গেলে তার আকার-আকৃতি বদলে যায়। বার্ধক্য এসে তাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। সে কুশ্রী দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং কর্মক্ষমতা হারিয়ে অপরের উপর বোঝা হয়ে যায়। কারও কোন উপকারে আসে না। অন্যান্য জীবজন্তু এর বিপরীত। তারা শেষ পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকে। মানুষ তাদের কাছ থেকে দুগ্ধ, বোঝা বহন এবং অন্যান্য বহু রকম কাজ নেয়। তাদেরকে জবাই করা হলে অথবা তারা মারা গেলেও তাদের চামড়া, পশম, অস্থি মানুষের কাজে আসে। কিন্তু মানুষ যখন বার্ধক্যে অক্ষম হয়ে যায়, তখন সে সাংসারিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। মৃত্যুর পরও তার কোন অংশ দ্বারা কোন মানুষ অথবা জন্তুর উপকার হয় না। সার কথা, মানুষ যে নিকৃষ্টদের মধ্যে নিকৃষ্টতম, এর অর্থ তার বৈষয়িক ও শারীরিক অবস্থা। হযরত যাহ্হাক প্রমুখ থেকে এ তফসীরই বর্ণিত রয়েছে।—(কুরতুবী)

এ তফসীর অনুযায়ী পরের আয়াতে মু'মিন সৎকর্মীর ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মু'মিন সৎকর্মী বার্ধক্যে অক্ষম ও অপারক হয় না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের দৈহিক বেকারত্ব ও বৈষয়িক অকর্মন্যতার ক্ষতি তাদের হয় না বরং ক্ষতি কেবল তাদের হয় যারা নিজেদের সমগ্র চিন্তা ও যোগ্যতা বৈষয়িক উন্নতিতেই ব্যয় করেছিল। এখন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিন্তু মু'মিন সৎকর্মীর পুরস্কার ও সওয়াব কোন সময়ই নিঃশেষ হয় না। দুনিয়াতে বার্ধক্যের বেকারত্ব ও অপারকতার সম্মুখীন হলেও পরকালে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও সুখই সুখ বিদ্যমান থাকে। বার্ধক্য-জনিত বেকারত্ব ও কর্ম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তাদের আমলনামায় সেসব কর্ম লিখিত হয়, যা তারা শক্তিমান অবস্থায় করত। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন মুসলমান অসুস্থ হয়ে পড়লে আল্লাহ্ তা'আলা আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন, সুস্থ অবস্থায় সে যেসব সৎ কর্ম করত, সেগুলো তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করতে থাক।—(বুখারী) এছাড়া এস্থলে মু'মিন সৎ কর্মীর প্রতিদান জান্নাত ও তার নিয়ামত বর্ণনা করার পরিবর্তে বলা হয়েছে ঃ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ——অর্থাৎ তাদের পুরস্কার কখনও বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত হবে না। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তাদের এই পুরস্কার দুনিয়ার বৈষয়িক জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাদের জন্য বার্ধক্যে এমন খাঁটি সহচর জুটিয়ে দেন, যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের কাছ থেকে আত্মিক উপকারিতা লাভ করতে থাকেন এবং তাদের সর্বপ্রকার সেবাযত্ন করেন। এভাবে বার্ধক্যের যে স্তরে মানুষ বৈষয়িক ও দৈহিক দিক দিয়ে অকেজো, বেকার ও অপরের উপর বোঝারূপে গণ্য হয়, সে স্তরেও আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ বেকার থাকেন না। কোন কোন তফসীরবিদ আলোচ্য

আয়াতের এরূপ তফসীর করেছেন যে, رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ——সাধারণ মানুষের জন্য নয় বরং কাফির ও পাপাচারীদের জন্য বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত সুন্দর অবয়ব, গুণগত উৎকর্ষ ও বিবেককে বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনে বরবাদ করে দেয়। এই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হিসাবে তাদেরকে হীনতম পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا বাক্যের ব্যতিক্রম বাহ্যিক অর্থেই বহাল থাকে। অর্থাৎ যারা মু'মিন ও সৎকর্মী, তাদেরকে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌঁছানো হবে না। কেননা, তাদের পুরস্কার সব সময়ই অব্যাহত থাকবে।—(মাযহারী)

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ——এতে কিয়ামতে অবিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র কুদরতের উপরোক্ত দৃশ্য ও পরিবর্তন দেখার পরও তোমাদের জন্য পরকাল ও কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করার কি অবকাশ থাকতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা কি সব বিচারকের মহা বিচারক নন ?

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা তীনের أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ পর্যন্ত পাঠ করে, তার উচিত وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ বলা। সেমতে ফিকাহ্বিদগণের মতেও এই বাক্যটি পাঠ করা মোস্তাহাব।

سورة العلق

সূরা আলাক

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ১৯ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ
الْاَكْرَمُ ۝٣ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥ كَلَّآ اِنَّ
الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۝٦ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝٧ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۝٨ اَرَءَيْتَ الَّذِىْ
يَنْهٰى ۝٩ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۝١٠ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۝١١ اَوْ اَمَرَ
بِالتَّقْوٰى ۝١٢ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝١٣ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۝١٤ كَلَّا لَئِنْ
لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ۝١٥ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝١٦ فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۝١٧
سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝١٨ كَلَّا ۙ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩ ۝١٩ السجدة

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। (৩) পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, (৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (৬) সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, (৭) একারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। (৮) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে। (৯) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে (১০) এক বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে? (১১) আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎ পথে থাকে (১২) অথবা আল্লাহ্‌ভীতি শিক্ষা দেয়। (১৩) আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৪) সে কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ দেখেন? (১৫) কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই---(১৬) মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ। (১৭) অতএব, সে তার সভাসদদেরকে আহ্‌বান করুক। (১৮) আমিও আহ্‌বান করব জাহান্নামের

প্রহরীদেরকে। (১৯) কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সিজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(اِقْرَأْ থেকে مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতরণের মাধ্যমে নবুয়তের সূচনা হয়। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে এর কাহিনী এভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, নবুয়ত লাভের কিছু দিন পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাআপনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে যান। তিনি হেরা গিরিগুহায় গমন করে কয়েক রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করতেন। এক দিন হঠাৎ জিবরাঈল এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন ঃ اقرأ অর্থাৎ পাঠ করুন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ما انا بقارئ অর্থাৎ আমি যে পড়তে জানি না। জিবরাঈল তাঁকে সজোরে চেপে ধরলেন, অতঃপর ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ اقرأ পাঠ করুন। তিনি আবারও সে জওয়াবই দিলেন। এমনিভাবে তিন বার চেপে ধরলেন ও ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ اقرا থেকে مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত)

হে পয়গম্বর (এ সময়কার আয়াতগুলোসহ আপনার প্রতি যে কোরআন নাযিল হবে, তা) আপনি আপনার পালনকর্তার নাম নিয়ে পাঠ করুন। [অর্থাৎ যখন পাঠ করেন, তখন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' বলে পাঠ করুন। অন্য এক আয়াতে اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ বলে কোরআন পাঠের সাথে আউযুবিল্লাহ্ পড়ার আদেশ করা হয়েছে। এ দু'টি আদেশের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ও তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। এটা মনে মনে বলা ওয়াজিব এবং মুখে উচ্চারণ করা সুন্নত। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিসমিল্লাহ্ জানা থাকা জরুরী নয়। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েতে এ সূরার সাথে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম নাযিল হওয়াও বর্ণিত আছে।

اخرجه الواحدى عن عكرمة والحسن انهما قالا اول ما نزل بسم الله الرحمٰن الرحيم واول سورة اقرأ واخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس انه قال اول ما نزل جبرائيل عليه السلام على النبى صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استعذ ثم قل بسم الله الرحمٰن الرحيم - كذا فى روح المعانى -

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র নামে পাঠ করতে বলা হয়েছে। এ আয়াতে স্বয়ং এই আয়াতসমূহও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটা এমন যেমন কেউ অপরকে বলে, আমি যা বলি শুন। এতে স্বয়ং এই বাক্যটি শুনার আদেশ করাও বক্তার উদ্দেশ্য থাকে। অতএব সারকথা এই যে, এ আয়াতগুলো পাঠ করুন অথবা পরে যেসব আয়াত নাযিল হবে, সেগুলো পাঠ করুন, সবগুলোর পাঠই আল্লাহ্‌র নামে হওয়া উচিত। রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানতে পেরেছিলেন যে, এটা কোরআন ও ওহী। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি ভীত হয়ে গিয়েছিলেন এবং ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে গমন করেছিলেন। অবশ্য সন্দেহের কারণে ছিল না বরং ওহীর ভীতির কারণে তিনি এরূপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিষয়টি ওয়ারাকার কাছে বর্ণনা করা ছিল মানসিক শান্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, অবিশ্বাসের কারণে নয়। শিক্ষক ছাত্রকে অক্ষর শিক্ষাদান আরম্ভ করার সময় বলেন ঃ পড়। একে কেউ অসাধ্য কাজের আদেশ বলে না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওযর করার এক কারণ এই যে, তিনি কি পড়বেন, তা তাঁর কাছে নির্দিষ্ট ছিল না। এটা পয়গম্বরের শানের খেলাফ হয়। দ্বিতীয় কারণ এই যে, পাঠ করা অধিকাংশ সময় লিখিত বিষয় পড়ার অর্থে ব্যবহৃত নয়। তাঁর যেহেতু অক্ষরজ্ঞান ছিল না, তাই এই ওযর করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে ওহীর গুরুভার বহন করার যোগ্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্ভবত জিবরাঈল তাঁকে চেপে ধরেছিলেন। والله اعلم পালনকর্তা (رب) শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমি আপনার পুরোপুরি পালন করব এবং নবুয়তের উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেব। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তিনি এমন পালনকর্তা যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন। (বিশেষভাবে এ গুণটি উল্লেখ করার তাত্ত্বিক কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এ নিয়ামতটিই প্রকাশ পায়। অতএব সর্বাগ্রে এরই উল্লেখ সমীচীন। এছাড়া সৃষ্টিকর্ম স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। স্রষ্টার জ্ঞান লাভ করাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য কাজ। ব্যাপক সৃষ্টির কথা বলার পর এখন বিশেষ বিশেষ সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে—) যিনি (সব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিশেষভাবে) মানুষকে জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। (এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিরূপী নিয়ামতসমূহের মধ্যে সাধারণ সৃষ্ট বস্তুর তুলনায় মানুষের প্রতি অধিক নিয়ামত রয়েছে। তাকে অনেক উন্নত করেছেন, চমৎকার আকার-আকৃতি দিয়েছেন এবং জ্ঞান গরিমায় সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং মানুষের অধিক শোকর ও যিকর করা উচিত। বিশেষভাবে জমাট রক্ত উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এটা একটা বরযখী অবস্থা। এর আগে রয়েছে বীর্য, খাদ্য ও উপাদান এবং এরপরে রয়েছে মাংসপিণ্ড, অস্থি গঠন ও আত্মাদান। সুতরাং জমাট রক্ত যেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থাসমূহের মধ্যবর্তী একটি অবস্থা। অতঃপর কোরআন পাঠ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা সাব্যস্ত করার জন্য বলা হয়েছে ঃ) আপনি কোরআন পাঠ করুন। (অর্থাৎ প্রথম আদেশ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, এখানে আসল উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহ্‌র নাম বরং পাঠ করাও উদ্দেশ্য। কেননা, পাঠ করাই তবলীগের উপায় এবং পয়গম্বরের

আসল কাজই তবলীগ। সুতরাং এই পুনরুল্লেখ দ্বারা একথাও প্রকাশ পেয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তবলীগের আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর সে ওযর দূর করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যা তিনি প্রথমে জিবরাঈলের কাছে পেশ করেছিলেন যে, তিনি পড়া জানেন না ঃ বলা হয়েছে ঃ) আপনার পালনকর্তা দয়ালু (যা ইচ্ছা দান করেন) যিনি (লেখাপড়া জানাদেরকে) কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন (এবং সাধারণভাবে) মানুষকে (অন্যান্য উপায়ে) শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না। [অর্থাৎ প্রথমত শিক্ষা লেখার মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ নয় ---অন্যান উপায়েও শিক্ষা হতে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত উপায়াদি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল নয়---প্রকৃত শিক্ষাদাতা আমি। সুতরাং আপনি লেখা না জানলেও আমি অন্য উপায়ে আপনাকে পড়া এবং ওহীর জ্ঞান সংরক্ষণের শক্তি দান করব। কারণ, আমি আপনাকে পাঠ করার আদেশ দিয়েছি। বাস্তবেও তাই হয়েছিল। সুতরাং এ আয়াতসমূহে নবুয়ত ও তার ভূমিকা এবং পরিপূরক বিষয়াদির বর্ণনা হয়ে গেছে। যেহেতু পয়গম্বরের বিরোধিতা চরম গোনাহ্ ও গর্হিত কাজ, তাই অনেক পরে অবতীর্ণ পরবর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিশিষ্ট্য বিরোধিতাকারী আবূ জাহ্লের নিন্দা ব্যাপক ভাষায় করা হয়েছে। ফলে অন্যান্য বিরোধিতা-কারীও এতে শামিল হয়ে গেছে। এসব আয়াত অবতরণের হেতু এই যে, একবার আবূ জাহ্ল রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নামায পড়তে দেখে বলল ঃ আমি আপনাকে নামায পড়তে বারবার নিষেধ করেছি। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ধমক দিলে সে বলল ঃ মক্কার অধিকাংশ লোকই আমার সাথে রয়েছে। যদি আপনাকে ভবিষ্যতে নামায পড়তে দেখি, তাহলে আপনার ঘাড়ে পা রেখে দেব (নাউযুবিল্লাহ্)। সেমতে সে একবার নামায পড়ার সময় হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে এগিয়ে এল কিন্তু হুযূর (সা)-এর কাছাকাছি গিয়ে থেমে গেল এবং পেছনের দিকে সরতে লাগল। পরে এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে বলল ঃ আমি সামনে একটি অগ্নিপূর্ণ গর্ত দেখেছি এবং তাতে পাখাবিশিষ্ট কিছু বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) একথা শুনে বলেন ঃ তারা ছিল ফেরেশতা। যদি আবূ জাহ্ল আরও সামনে এগোত, তবে ফেরেশ-তারা তাকে টুকরা টুকরা করে দিত। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে] সত্যি সত্যি (কাফির) মানুষ সীমালংঘন করে। কারণ, সে নিজেকে (অন্যদের থেকে) অমুখাপেক্ষী মনে করে। (অন্য আয়াতে আছে ঃ وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا ---অথচ এই অমুখাপেক্ষিতার কারণে অবাধ্যতা করা নির্বু-দ্ধিতা। কেননা, কেউ যদি সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন দিক দিয়ে অমুখাপেক্ষী হয়েও যায় কিন্তু স্রষ্টার প্রতি সে কোন অবস্থাতেই অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। এমনকি পরিশেষে হে মানুষ) তোমার পালনকর্তার দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন হবে। (কখনও জীবদ্দশার ন্যায় তাঁর কুদরত দ্বারা বেষ্টিত হবে এবং তখন অবাধ্যতার যে শাস্তি হবে, তা থেকেও কোথাও পালাতে পারবে না। সুতরাং অক্ষম ব্যক্তি সক্ষমের প্রতি কেমন করে অমুখাপেক্ষী হতে পারে ? অতএব নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করা এবং তজ্জন্য অবাধ্যতা করা বোকামিই বটে। অতঃপর জিজ্ঞাসার আকারে অবাধ্যতার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে---) হে মানুষ,

তুমি কি তাকে দেখেছ, যে (আমার) এক বান্দাকে নামায পড়তে বারণ করে ? (অর্থাৎ এর চেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় আর নেই। নামাযীকে নামায পড়তে বারণ করা খুবই মন্দ ও বিস্ময়কর বিষয়। অতঃপর অধিকতর তাকীদ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে) হে ব্যক্তি, তুমি কি দেখেছ, যদি সে বান্দা (যাকে বারণ করা হয়েছে) সৎ পথে থাকে (যা নিজস্ব গুণ) অথবা অপরকে আল্লাহ্‌ভীতি শিক্ষা দেয় (যা পরোপকার। 'অথবা' বলে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দু'টি গুণের মধ্যে একটি থাকলেও নিষেধকারীর নিন্দার জন্য যথেষ্ট হত। আর তার মধ্যে তো দু'টিই রয়েছে)। হে ব্যক্তি, তুমি কি দেখেছ, যদি সে (নিষেধকারী) বান্দা মিথ্যারোপ করে এবং (সত্যধর্ম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ বিশ্বাসও না রাখে এবং আমলও না করে। প্রথমে দেখ যে, নামায পড়তে বারণ করা কত মন্দ ! এরপর লক্ষ্য কর, বারণকারী একজন পথভ্রষ্ট এবং যাকে বারণ করছে সে একজন সৎ পথপ্রাপ্ত। সুতরাং এটা কেমন বিস্ময়কর ব্যাপার ! অতঃপর বারণকারীর উদ্দেশ্যে শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে---) সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা (তার অবাধ্যতা এবং তা থেকে উৎপন্ন কার্যকলাপ) দেখছেন (এর জন্য) তিনি শাস্তি দেবেন ? (তার কখনও এরূপ করা উচিত নয়।) যদি সে (এই কর্মকাণ্ড থেকে) বিরত না হয়, তবে আমি (তাকে) মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে যা, মিথ্যা ও পাপে আপ্লুত কেশগুচ্ছ (জাহান্নামের দিকে) হেঁচড়াবই। (সে তার দলবলের স্পর্ধা দেখিয়ে আমার পয়গম্বরকে হুমকি দেয়---) অতএব সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক, (সে এরূপ করলে) আমিও জাহান্নামের প্রহরীদেরকে আহ্বান করব। [সে আহ্বান করেনি বলে আল্লাহ্ তা'আলাও ফেরেশতাগণকে আহবান করেন নি। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আবূ জাহ্‌ল এরূপ করলে জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাগণ অবশ্যই প্রকাশ্যে তাকে পাকড়াও করত]। কখনও তার এরূপ করা উচিত নয়। আপনি (এই নালায়েকের কোন পরওয়া করবেন না এবং) তার কথা মেনে চলবেন না (যেমন এ পর্যন্ত মেনে চলেন নি) এবং (পূর্ববৎ) সিজদা করুন এবং আমার নৈকট্য অর্জন করুন। [এতে ওয়াদা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবেন]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ওহীর সূচনা ও সর্বপ্রথম ওহী ঃ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে, সূরা আলাক থেকেই ওহীর সূচনা হয় এবং এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত (عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ... مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত) সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ সূরা মুদ্দাস্‌সিরকে সর্বপ্রথম সূরা এবং কেউ কেউ সূরা ফাতিহাকে সর্বপ্রথম সূরা বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম বগভী অধিকাংশ আলিমের মতকেই বিশুদ্ধ বলেছেন। সূরা মুদ্দাস্‌সিরকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, সূরা আলাকের পাঁচ আয়াত নাযিল হওয়ার পর দীর্ঘকাল কোরআন অবতরণ বন্ধ থাকে, যাকে ওহীর বিরতিকাল বলা হয়ে থাকে---এই বিরতির কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ মর্মবেদনা ও মানসিক অশান্তির সম্মুখীন হন। এরপর একদিন হঠাৎ জিবরাঈল (আ) সামনে আসেন

এবং সূরা মুদ্দাস্‌সির অবতীর্ণ হয়। এ সময়ও ওহী অবতরণ এবং জিবরাঈলের সাথে সাক্ষাতের দরুন রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে সে পূর্বের মতই ভাবান্তর দেখা দেয়, যা সূরা আলাক অবতীর্ণ হওয়ার সময় দেখা দিয়েছিল। এভাবে বিরতিকালের পর সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রাথমিক আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। ফলে একেও প্রথম সূরা আখ্যা দেওয়া যায়। সূরা ফাতিহাকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, পূর্ণ সূরা হিসাবে একত্রে সূরা ফাতিহাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এর আগে কয়েকটি সূরার অংশবিশেষই অবতীর্ণ হয়েছিল।—(মাযহারী)

বুখারী ও মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদীসে নবুয়ত ও ওহীর সূচনা সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেনঃ সর্বপ্রথম সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহীর সূচনা হয়। তিনি স্বপ্নে যা দেখতেন, বাস্তবে হুবহু তাই সংঘটিত হত এবং তাতে কোনরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকত না। স্বপ্নে দেখা ঘটনা দিবালোকের মত সামনে এসে যেত।

এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে নির্জনতার ও একান্তে ইবাদত করার প্রবল ঝোঁক সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি হেরা গিরিগুহাকে পছন্দ করে নেন (এ গুহাটি মক্কার কবরস্থান জান্নাতুল মুয়াল্লা থেকে একটু সামনে জাবালুন্নূর নামক পাহাড়ে অবস্থিত। এর শৃঙ্গ দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়)। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ তিনি এ গুহায় রাত্রিতে গমন করতেন এবং ইবাদত করতেন। পরিবার -পরিজনের খবরাখবর নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা না দিলে তিনি সেখানেই অবস্থান করতেন এবং প্রয়োজনীয় পাথেয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। পাথেয় শেষ হয়ে গেলে তিনি পত্নী খাদীজা (রা)-র কাছে ফিরে আসতেন এবং আরও কিছুদিনের পাথেয় নিয়ে গুহায় গমন করতেন। এমনিভাবে গুহায় অবস্থানকালে হঠাৎ একদিন তাঁর কাছে ওহী আগমন করে। হেরা গুহায় নির্জনবাসের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি পূর্ণ রমযান মাস এ গুহায় অবস্থান করেন। ইবনে ইসহাক ও যরকানী (র) বলেনঃ এর চেয়ে বেশী সময় অবস্থান করার প্রমাণ কোন রেওয়ায়েতে নেই। ওহী অবতরণের পূর্বে নামায ইত্যাদি ইবাদতের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং হেরা গুহায় রসূলুল্লাহ্ (সা) কিভাবে ইবাদত করতেন সে সম্পর্কে কোন কোন আলিম বলেনঃ তিনি নূহ্, ইবরাহীম ও ঈসা (আ)-র শরীয়ত অনুসরণ করে ইবাদত করতেন। কিন্তু কোন রেওয়ায়েতে এর প্রমাণ নেই এবং তিনি নিরক্ষর ছিলেন বিধায় একে বিশুদ্ধও মেনে নেওয়া যায় না। বরং বাহ্যত বোঝা যায় যে, তখন জনকোলাহল থেকে একান্তে গমন এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ ধ্যানে মগ্ন হওয়াই ছিল তাঁর ইবাদত।—(মাযহারী)

ওহীর আগমন সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ হযরত জিবরাঈল (আ) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আগমন করে বললেনঃ اِقْرَأْ (পাঠ করুন)। তিনি বলেনঃ ما انا بقارئ আমি পড়া জানি না। [কারণ, তিনি উম্মী ছিলেন। জিবরাঈল (আ)-এর উদ্দেশ্য কি, কিভাবে পড়াতে চান এবং কোন লিখিত বিষয় পড়তে হবে কিনা ইত্যাদি বিষয় তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হন নি। তাই ওযর পেশ করেছেন।] রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমার এ জওয়াব শুনে জিবরাঈল (আ) আমাকে বুকে জড়িয়ে

ধরলেন এবং সজোরে চাপ দিলেন। ফলে আমি চাপের কষ্ট অনুভব করি। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ اِقْرَأْ (পাঠ করুন)। আমি আবার পূর্ববৎ জওয়াব দিলাম।

এতে তিনি পুনরায় আমাকে চেপে ধরলেন। চাপের কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় বারের মত পাঠ করতে বললেন। আমি এবারও পূর্ববৎ জওয়াব দিলে তিনি তৃতীয়বারের মত আমাকে বুকে চেপে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ○

কোরআনের এই সর্বপ্রথম পাঁচখানি আয়াত নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে ফিরলেন। তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। খাদীজা (রা)-র কাছে পৌঁছে বললেন ঃ زملونى زملونى আমাকে আবৃত কর, আমাকে আবৃত কর। খাদীজা (রা) তাঁকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করলে কিছুক্ষণ পর ভীতি বিদূরিত হল। এ ভাবান্তর ও কম্পন জিবরাঈল (আ)-এর ভয়ে ছিল না। তাঁর শান এর চেয়ে আরও অনেক উর্ধ্বে বরং এই ওহীর মাধ্যমে নবুয়তের যে বিরাট দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করা হয়েছিল, তারই গুরুভার তিনি তিলে তিলে অনুভব করছিলেন। এছাড়া একজন ফেরেশতাকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার কারণে তিনি স্বাভাবিকভাবেই ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজা (রা)-কে হেরা গুহার সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়ে বললেন ঃ এতে আমার মধ্যে এমন ভাবান্তর দেখা দেয় যে, আমি জীবনের ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়ি। হযরত খাদীজা (রা) বললেন ঃ না, এরূপ কখনও হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কখনও ব্যর্থ হতে দেবেন না। কেননা, আপনি আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, বোঝাক্লিষ্ট লোকদের বোঝা বহন করেন, বেকারকে কাজে নিয়োজিত করেন, অতিথি সেবা করেন এবং বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন। হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন বিদুষী মহিলা। তিনি সম্ভবত তওরাত ও ইঞ্জিল থেকে অথবা এসব আসমানী কিতাবের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, উপরোক্ত চরিত্র-গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি কখনও বঞ্চিত ও ব্যর্থ হন না। তাই এভাবে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

এরপর খাদীজা (রা) তাঁকে আপন পিতৃব্যপুত্র ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে নিয়ে গেলেন। ইনি জাহিলিয়াত যুগে প্রতিমাপূজা বর্জন করে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, যা ছিল তৎকালে একমাত্র সত্য ধর্ম। শিক্ষিত হওয়ার সুবাদে হিব্রু ভাষায়ও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। আরবী ছিল তাঁর মাতৃভাষা। তিনি হিব্রু ভাষায়ও লিখতেন এবং ইঞ্জীল আরবীতে অনুবাদ করতেন। তখন তিনি অত্যধিক বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। বার্ধক্যের কারণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লুপ্তপ্রায় ছিল। হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন ঃ ভাইজান, আপনি

তাঁর কথাবার্তা একটু শুনুন। ওয়ারাকার জিজ্ঞাসার জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সা) হেরা গুহার সমুদয় বৃত্তান্ত বলে শোনালেন। শোনামাত্রই ওয়ারাকা বলে উঠলেন ঃ ইনিই সে পবিত্র ফেরেশতা, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-র কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হায়, আমি যদি আপনার নবুয়তকালে শক্তিশালী হতাম! হায়, আমি যদি তখন জীবিত থাকতাম, যখন আপনার কওম আপনাকে (দেশ থেকে) বহিষ্কার করবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার স্বজাতি কি আমাকে বহিষ্কার করবে? ওয়ারাকা বললেন ঃ অবশ্যই বহিষ্কার করবে। কারণ, যখনই কোন ব্যক্তি সত্য পয়গাম ও সত্যধর্ম নিয়ে আগমন করে, যা আপনি নিয়ে এসেছেন, তখনই তার কওম তার উপর নিপীড়ন চালায়। যদি আমি সে সময়কাল পাই, তবে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। ওয়ারাকা এর কয়েকদিন পরই ইহলোক ত্যাগ করেন। এই ঘটনার পরই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়।---(বুখারী, মুসলিম) সোহায়লী বর্ণনা করেন, ওহীর বিরতিকাল ছিল আড়াই বছর। কোন কোন রেওয়ায়েতে তিন বছরও আছে।---(মাযহারী)

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ—এখানে اسم-শব্দ যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখনই কোরআন পড়বেন, আল্লাহ্র নাম অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা শুরু করবেন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পেশকৃত ওযরের জওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনি যদিও বর্তমান অবস্থায় উম্মী ; লেখাপড়া জানেন না কিন্তু আপনার পালনকর্তা উম্মী ব্যক্তিকে উচ্চতর শিক্ষা, বক্তৃতা নৈপুণ্য, বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতার এমন পরাকাষ্ঠা দান করতে পারেন, যার সামনে বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ পেয়েছিল।---(মাযহারী) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ্র 'রব' নামটি উল্লেখ করায় এ বিষয়বস্তু আরও জোরদার হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই আপনার পালনকর্তা। তিনি সর্বতোভাবে আপনাকে পালন করেন। তিনি উম্মী হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে পাঠ করাতে সক্ষম। আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্য থেকে এ স্থলে বিশেষভাবে সৃষ্টিগুণ উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত রহস্য এই যে, সৃষ্টি তথা অস্তিত্ব দান করাই সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সর্বপ্রথম অনুগ্রহ। এ স্থলে ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য خلق-ক্রিয়াপদের কর্ম উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগতই এই সৃষ্টি কর্মের ফল।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ—পূর্বের আয়াতে সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টির বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সেরা সৃষ্টি মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় সমগ্র বিশ্বজগতের সার-নির্যাস হচ্ছে মানুষ। জগতে যা কিছু আছে, তার প্রত্যেকটির নযীর মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। তাই মানুষকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করার এক কারণ এরূপ হতে পারে যে, নবুয়ত, রিসালত ও কোরআন নাযিল করার লক্ষ্য আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পালন করানো। এটা বিশেষভাবে মানুষেরই কাজ ; علق-শব্দের অর্থ জমাট রক্ত, মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রান্ত হয়। মৃত্তিকা ও উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা এর সূচনা

হয়, এরপর বীর্য ও এরপর জমাট রক্তের পালা আসে। অতঃপর মাংসপিণ্ড ও অস্থি ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এসবের মধ্যে জমাট রক্ত হচ্ছে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। এর উল্লেখ করায় এর পূর্বাপর অবস্থাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে।

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ——এখানে اقرأ-আদেশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এর এক কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও হতে পারে যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পাঠ করার জন্য প্রথম اقرأ-বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় اقرأ তবলীগ, দাওয়াত ও অপরকে পাঠ করানোর জন্য বলা হয়েছে। اكرم বিশেষণে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জগৎ সৃষ্টি ও মানব সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিজের কোন স্বার্থ ও লাভ নেই বরং এগুলো সব দানশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। ফলে তিনি অযাচিতভাবে সৃষ্ট-জগৎকে অস্তিত্বের মহান নিয়ামত দান করেছেন।

اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ——মানব সৃষ্টির পর মানব শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। কারণ, শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে স্বতন্ত্র এবং সৃষ্টির সেরা রূপে চিহ্নিত করে। শিক্ষার পদ্ধতি সাধারণত দ্বিবিধ। এক. মৌখিক শিক্ষা এবং দুই. কলম ও লেখার মাধ্যমে শিক্ষা। সূরার শুরুতে اقرأ—শব্দের মধ্যে মৌলিক শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু এ আয়াতে শিক্ষাদান সম্পর্কিত বর্ণনায় কলমের সাহায্যে শিক্ষাকেই অগ্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিক্ষার সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় কলম ও লিখন ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র এক রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لما خلق الله الخلق كتب فى كتابه فهو عند ه فوق العرش ان رحمتى غلبت غضبى——অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদিকালে সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ

اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما يكون الى يوم القيامة فهو عند ه فى الذكر فوق عرشه -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সেমতে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে। এ কিতাব আল্লাহ্র কাছে আরশে রক্ষিত আছে।—(কুরতুবী)

কলম তিন প্রকার ঃ আলিমগণ বলেন ঃ জগতে তিনটি কলম আছে ঃ এক. আল্লাহ্ তা'আলার স্বহস্তে সৃজিত সর্বপ্রথম কলম, যাকে তিনি তকদীর লেখার আদেশ করেছিলেন। দুই. ফেরেশতাগণের কলম, যদ্দ্বারা তারা ভবিতব্য ঘটনা, তার পরিমাণ এবং মানুষের

আমলনামা লিপিবদ্ধ করেন। তিন. সাধারণ মানুষের কলম, যদ্দ্বারা তারা তাদের কথা-বার্তা লিখে এবং নিজেদের অভীষ্ট কাজে ব্যবহার করে। লিখন প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার বর্ণনা এবং বর্ণনা মানুষের বিশেষ গুণ।---(কুরতুবী) তফসীরবিদ মুজাহিদ আবূ আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্ট জগতে চারটি বস্তু স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। এগুলো ব্যতীত সব বস্তু 'কুন' তথা 'হয়ে যাও' আদেশের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। সেই বস্তু চতুষ্টয় এই ঃ কলম, আরশ, জান্নাতে আদন ও আদম (আ)।

লিখন জ্ঞান সর্বপ্রথম দুনিয়াতে কাকে দান করা হয় ঃ কেউ কেউ বলেন—সর্বপ্রথম এই জ্ঞান মানবপিতা আদমকে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম লেখা শুরু করেন।--- (কা'বে আহবার) কেউ কেউ বলেন, হযরত ইদরীস (আ)-ই দুনিয়াতে সর্বপ্রথম লেখক।---(যাহ্হাক) কারও কারও মতে প্রত্যেক লেখকের শিক্ষাই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

অংকন ও লিখন আল্লাহ্র বড় নিয়ামত ঃ হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেন, কলম আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। কলম না থাকলে কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকত না এবং দুনিয়ার কাজকারবারও সঠিকভাবে পরিচালিত হত না। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ এটা আল্লাহ্ তা'আলার একটা বড় কৃপা যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে অজ্ঞাত বিষয়-সমূহের জ্ঞান দান করেছেন এবং তাদেরকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে বের করে এনেছেন। তিনি মানুষকে লিখন বিদ্যায় উৎসাহিত করেছেন। কেননা, এর উপকারিতা অপরিসীম। আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তা গণনা করে শেষ করতে পারে না। যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ইতিহাস, জীবনালেখ্য ও উক্তি আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ কিতাবসমূহ সমস্তই কলমের সাহায্যে লিখিত হয়েছে এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকবে। কলম না থাকলে ইহকাল ও পরকালের সব কাজকর্মই বিঘ্নিত হবে।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণ সর্বদা লিখন কর্মের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের অগণিত রচনাশৈলীই এর উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান যুগে আলিম ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি চরম উদাসীনতা বিরাজমান রয়েছে। ফলে শত শত লোকের মধ্যে দু'চারজনই এ ব্যাপারে পণ্ডিত দৃষ্টিগোচর হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লিখন শিক্ষা না দেওয়ার রহস্য ঃ আল্লাহ্ তা'আলা শেষ নবী (সা)-র মর্যাদাকে মানুষের চিন্তা ও অনুমানের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য তাঁর জন্মস্থান থেকে ব্যক্তিগত অবস্থা পর্যন্ত সবকিছুকে এমন করেছিলেন যে, কোন মানুষ এসব ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও শ্রম দ্বারা কোন উৎকর্ষ অর্জন করতে পারে না। তাঁর জন্মস্থানের জন্য আরবের মরুভূমি মনোনীত হয়েছে, যা সভ্য জগৎ ও জ্ঞান-গরিমার পীঠভূমি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং পথ ও যোগাযোগের দিক দিয়ে অত্যধিক দুর্গম ছিল। ফলে শাম, ইরাক, মিসর ইত্যাদি উন্নত নগরীর অধিবাসীদের সাথে সেখানকার লোকদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এ

কারণেই আরবের সবাই উম্মী বলে কথিত হয়। এমন দেশ ও গোত্রের মধ্যে জন্মগ্রহণের পর আল্লাহ্ তা'আলা আরও কিছু ব্যবস্থা করলেন। তা এই যে, আরবদের মধ্যে যদিও বা খুব নগণ্য সংখ্যক লোক জ্ঞান-বিজ্ঞান, অঙ্কন ও লিখন বিদ্যা শিক্ষা করত, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তা শিক্ষা করারও সুযোগ দেওয়া হয়নি। এহেন প্রতিকূল পরিবেশে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির কাছ থেকে কে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নত চরিত্র আশা করতে পারত? হঠাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের অলংকারে ভূষিত করলেন এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক অশেষ ফল্গুধারা তাঁর মুখ দিয়ে প্রবাহিত করে দিলেন। বিশুদ্ধতায় ও প্রাঞ্জলতায় আরবের বড় বড় কবি ও অলংকারবিদও তাঁর কাছে হার মেনে যায়। এই প্রোজ্জ্বল মো'জেযাটি স্বচক্ষে দেখে এ প্রত্যয় না করে উপায় নেই যে, তাঁর এসব গুণ-গরিমা মানবীয় প্রচেষ্টা ও কর্মের ফলশ্রুতি নয় বরং আল্লাহ্ তা'আলার অদৃশ্য দান। অংকন ও লিখন শিক্ষা না দেওয়ার মধ্যে এ রহস্যই নিহিত ছিল।----(কুরতুবী)

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ----পূর্বের আয়াতে ছিল কলমের সাহায্যে শিক্ষা দানের বর্ণনা। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শিক্ষার মাধ্যম অসংখ্য, অগণিত---শুধু কলমের মধ্যেই সীমিত নয়। তাই বলা হয়েছে---আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে পূর্বে জানত না। এতে কলম অথবা অন্য কোন উপায় উল্লেখ না করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার এ শিক্ষা মানুষের জন্মলগ্ন থেকে অব্যাহত রয়েছে। তিনি মানুষকে প্রথমে বুদ্ধি দান করেন, যা জ্ঞান লাভের সর্ববৃহৎ উপায়। মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে কোন শিক্ষা ব্যতিরেকে অনেক কিছু শিখে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সামনে ও পেছনে স্বীয় অসীম কুদরতের বহু নিদর্শন রেখে দিয়েছেন। যাতে সে সেগুলো প্রত্যক্ষ করে তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে। এরপর ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে অনেক বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে দান করেছেন। এছাড়া আরও বহু বিষয়ে জ্ঞান মানুষের মস্তিষ্ক আপনা-আপনি জাগ্রত করে দিয়েছিলেন। এতে কোন ভাষা অথবা কলমের সাহায্যে শিক্ষার দখল নেই। একটি চেতনাহীন শিশু জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তার খাদ্যের কেন্দ্র অর্থাৎ জননীর স্তনযুগলকে চিনে নেয়। স্তন থেকে দুগ্ধ বের করার জন্য মুখ চেপে ধরার কৌশল তাকে কে শিক্ষা দেয় এবং দিতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা শিশুকে ক্রন্দন করার কৌশল জন্মলগ্ন থেকেই শিখিয়ে দেন। তার এই ক্রন্দন তার অনেক প্রয়োজন মেটানোর উপায় হয়ে থাকে। তাকে ক্রন্দনরত দেখলে পিতামাতা তার কষ্টের কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়েন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উত্তাপ, শৈত্য ইত্যাদি অভাব ক্রন্দনের দ্বারাই বিদূরিত হয়। সদ্যপ্রসূত শিশুকে এই ক্রন্দন কে শেখাতে পারত এবং কিভাবে শেখাত? এগুলো সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান, যা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণী বিশেষত মানুষের মস্তিষ্কে সৃষ্টি করে দেন। এই জরুরী শিক্ষার পর মৌখিক শিক্ষা ও অন্তরগত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। مَا لَمْ يَعْلَمْ (যা সে জানত না) বলার বাহ্যত কোন প্রয়োজন ছিল না! কারণ, শিক্ষা স্বভাবত অজানা

বিষয়েরই হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এজন্য বলা হয়েছে, যাতে মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান ও কৌশলকে তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে না বসে। এতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের উপর এমনও এক সময় আসে, যখন সে কিছুই জানে না ; যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জননীর গর্ভ থেকে এমতাবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জান না। অতএব বোঝা গেল যে, মানুষের জ্ঞান-গরিমা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয় বরং স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ্ তা'আলারই দান।---(মাযহারী) কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতে ইনসানের অর্থ নিয়েছেন হযরত আদম (আ) অথবা রসূলে করীম (সা)। হযরত আদমকেই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম শিক্ষা দান করেছেন। বলা হয়েছে ঃ وعلم ادم الاسماء كلها —এবং নবী করীম (সা)-ই সর্বশেষ পয়গম্বর, যার শিক্ষায় পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের এবং লওহ ও কলমের শিক্ষা শামিল রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

ومن علومك علم اللوح والقلم ।

সূরা ইকরার উপরোক্ত পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত। এর পরবর্তী আয়াতসমূহ অনেক দিন পরে অবতীর্ণ হয়। কেননা, সূরার শেষ অবধি অবশিষ্ট আয়াত-সমূহ আবূ জাহ্লের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে মক্কায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কোন বিরুদ্ধবাদী ছিল না বরং সবাই তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করত, মনেপ্রাণে ভালবাসত ও সম্মান করত। আবূ জাহ্লের বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা বিশেষত নামাযে নিষেধ করার ঘটনা বলা বাহুল্য তখনকার, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) নবুয়ত ও দাওয়াত ঘোষণা করেন এবং রজনীতে নামাযের হুকুম অবতীর্ণ হয়।

كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى —আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবূ জাহ্লকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, ততদিন সোজা হয়ে চলে। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং অপরের উপর জুলুম ও নির্যাতনের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সাধারণত বিত্তশালী, শাসনক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গ এবং ধনজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সমর্থনপুষ্ট এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই প্রবণতা বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা ধনাঢ্যতা ও দলবলের শক্তিতে মদমত্ত হয়ে অপরকে পরোয়াই করে না। আবূ জাহ্লের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। সে ছিল মক্কার বিত্তশালীদের অন্যতম। তার গোত্র এমনকি সমগ্র শহরের লোক তাকে সমীহ করত। সে এমনি অহংকারে মত্ত হয়ে পয়গম্বরকুল শিরোমণি ও সৃষ্টির সেরা মানব রসূলে করীম (সা)-এর শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বসল।

পরের আয়াতে এমনি ধরনের অবাধ্য লোকদের অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ---অর্থাৎ সবাইকে তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাবে এবং ভাল-মন্দ কর্মের হিসাব নেবে। অবাধ্যতার কুপরিণাম স্বচক্ষে দেখে নেবে। এটাও অসম্ভব নয় যে, এ আয়াতে গর্বিত মানুষের গর্বের প্রতিকার বর্ণনা করার জন্য বলা হয়েছে ঃ হে নির্বোধ, তুমি নিজেকে সবকিছুর প্রতি অমুখাপেক্ষী ও স্বেচ্ছাধীন মনে কর কিন্তু চিন্তা করলে তুমি নিজেকে প্রতিটি উঠাবসায় ও চলাফেরায় আল্লাহ্‌র প্রতি মুখাপেক্ষী পাবে। তিনি যদি বাহ্যত তোমাকে কোন মানুষের মুখাপেক্ষী না করে থাকেন, তবে কমপক্ষে এটা তো দেখ যে, তোমাকে প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী করেছেন। মানুষের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত মনে করার বিষয়টিও বাহ্যিক বিভ্রান্তি বৈ কিছু নয়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ মানুষকে সমাজবদ্ধ জীবরূপে সৃষ্টি করেছেন। সে একা তার কোন প্রয়োজনই মেটাতে পারে না। সে তার মুখের একটি গ্রাসের প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখতে পাবে যে, সেটা হাজারো মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দীর্ঘদিনের সাধনার ফলশ্রুতি, যা সে অনায়াসে গিলে যাচ্ছে। এত হাজার হাজার মানুষকে নিজের কাজে নিয়োজিত করার সাধ্য কার আছে? মানুষের পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অবস্থাও তদ্রূপ। সেগুলো সরবরাহের পেছনে হাজারো, লাখো মানুষের শ্রম ব্যয়িত হচ্ছে, যারা কোন ব্যক্তি বিশেষের গোলাম নয়। কেউ তাদের সবাইকে বেতন দিয়ে কাজ করাতে চাইলেও তা সাধ্যাতীত ব্যাপার। এসব বিষয়ে চিন্তা করলে মানুষ এ রহস্য জানতে পারে যে, মানুষের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা তার নিজের তৈরী নয় বরং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অচিন্তনীয় প্রজ্ঞাবলে এই পরিকল্পনা তৈরী করেছেন ও চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কারও অন্তরে কৃষিকাজের ইচ্ছা জাগ্রত করেছেন, কারও মনে কাঠ কাটা ও মিস্ত্রীগিরির প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন, কাউকে কর্মকারের কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছেন, কাউকে শ্রম ও মজুরি করার মধ্যেই সন্তুষ্টি দান করেছেন এবং কাউকে বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতি উৎসাহিত করে মানুষের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের বাজার বসিয়ে দিয়েছেন। কোন রাষ্ট্র আইন করে এসব ব্যবস্থাপনা করতে পারে না এবং একা কোন ব্যক্তির পক্ষেও এটা সম্ভব নয়। তাই এই চিন্তা-ভাবনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই যে اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى অর্থাৎ পরিশেষে সব মানুষই যে আল্লাহ্‌র কুদরত ও প্রজ্ঞার অধীন, একথা জীবন্ত হয়ে দৃষ্টির সামনে এসে যায়।

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى عَبْدًا اِذَا صَلّٰى—এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নামাযের আদেশ লাভ করার পর যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) নামায পড়া শুরু করেন, তখন আবূ জাহ্‌ল তাঁকে নামায পড়তে বারণ করে এবং হুমকি দেয় যে, ভবিষ্যতে নামায পড়লে ও সিজদা করলে সে তাঁর ঘাড়

পদতলে পিষ্ট করে দেবে। এর জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى—অর্থাৎ সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখছেন? কি দেখছেন, এখানে তার উল্লেখ নেই। অতএব ব্যাপক অর্থে তিনি নামায প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষকেও দেখছেন এবং বাধাদানকারী হতভাগাকেও দেখছেন। দেখার পর কি হবে, তা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ভয়াবহ পরিণতির কল্পনাও করা যায় না।

سَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ—سفع-এর অর্থ কঠোরভাবে হেঁচড়ানো। ناصية শব্দের অর্থ কপালের উপরিভাগের কেশগুচ্ছ। যার এই কেশগুচ্ছ অন্যের মুঠোর ভেতরে চলে যায়, সে তার করতলগত হয়ে পড়ে।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ—এতে নবী করীম (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আবূ জাহ্লের কথায় কর্ণপাত করবেন না এবং সিজদা ও নামাযে মশগুল থাকুন। কারণ, এটাই আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের উপায়।

সিজদায় দোয়া কবূল হয় ঃ আবূ দাউদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء অর্থাৎ বান্দা যখন সিজদায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সিজদায় বেশী পরিমাণে দোয়া কর। অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ

فانه فمن ان يستجاب لكم—অর্থাৎ সিজদার অবস্থায় কৃত দোয়া কবূল হওয়ার যোগ্য।

নফল নামাযের সিজদায় দোয়া করার প্রমাণ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এর বিশেষ দোয়াও বর্ণিত আছে। বর্ণিত সে দোয়া পাঠ করাই উত্তম। ফরয নামায-সমূহে এ ধরনের দোয়া পাঠ করার প্রমাণ নেই। কারণ, ফরয নামায সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য আয়াত যে পাঠ করে এবং যে শুনে, সবার উপর সিজদা করা ওয়াজিব। সহীহ্ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা করেছেন।

سورة القدر

সূরা কদর

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ
أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ
حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে। (২) শবে-কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? (৩) শবে-কদর হল এক হাজার রাত্রি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৪) এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। (৫) এটা নিরাপত্তা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আমি একে (কোরআনকে) নাযিল করেছি শবে-কদরে। (সূরা দোখান এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অধিক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বলা হয়েছে ঃ) আপনি কি জানেন শবে-কদর কি? (অতঃপর জওয়াব দেওয়া হয়েছে ঃ) শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ এক হাজার মাস পর্যন্ত ইবাদত করার যে পরিমাণ সওয়াব, তার চেয়ে বেশী শবে-কদরে ইবাদত করার সওয়াব)।---(খাযেন) এ রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ্ (অর্থাৎ জিবরাঈল) তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে প্রত্যেক মঙ্গলজনক কাজ নিয়ে (পৃথিবীতে) অবতরণ করে (এবং এ রাত) আদ্যোপান্ত শান্তিময়। [হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে, শবে-কদরে হযরত জিবরাঈল একদল ফেরেশতাসহ আগমন করেন এবং যে ব্যক্তিকে নামায ও যিকিরে মশগুল দেখেন, তার জন্য রহমতের দোয়া করেন। কোরআনে একেই سلام বলা হয়েছে এবং মঙ্গলজনক কাজের অর্থও তাই। এছাড়া রেওয়ায়েত-সমূহে এ রাত্রিতে তওবা কবূল হওয়া, আকাশের দরজা উন্মুক্ত হওয়া এবং প্রত্যেক মু'মিনকে

ফেরেশতাগণের সালাম করার কথাও বর্ণিত আছে। এসব বিষয় যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে হয় এবং শান্তির কারণ হয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। অথবা سلام-এর অর্থ এখানে সেসব বিষয়, যা সূরা দোখানে امر حكيم বলে বোঝানো হয়েছে। এ রাত্রিতে সেসব বিষয় সম্পন্ন হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে]। সে শবে-কদর (এ সওয়াব ও বরকতসহ) ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে (অর্থাৎ কোন এক অংশে বরকত থাকবে, অন্য অংশে থাকবে না—এমন নয়)।

অনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল ঃ ইবনে আবী হাতেম (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার বনী ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল থাকে এবং কখনও অস্ত্র সংবরণ করেনি। মুসলমানগণ এ কথা শুনে বিস্মিত হলে এ সূরা কদর অবতীর্ণ হয়। এতে এ উম্মতের জন্য শুধু এক রাত্রির ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইবনে জরীর (র) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী ইসরাইলের জনৈক ইবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকত ও সকাল হতেই জিহাদের জন্য বের হয়ে যেত এবং সারাদিন জিহাদে লিপ্ত থাকত। সে এক হাজার মাস এভাবে কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা সূরা-কদর নাযিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, শবে-কদর উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য।---(মাযহারী)

ইবনে কাসীর ইমাম মালিকের এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। শাফেয়ী মযহাবের কেউ কেউ একে অধিকাংশের মযহাব বলেছেন। খাত্তাবী এর উপর ইজমা দাবী করেছেন। কিন্তু কোন কোন হাদীসবিদ এ ব্যাপারে ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন।

লায়লাতুল কদরের অর্থ ঃ কদরের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। কেউ কেউ এ স্থলে এ অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে একে 'লায়লাতুল কদর' তথা মহিমান্বিত রাত বলা হয়। আবূ বকর ওয়াররাক বলেন ঃ এ রাত্রিকে লায়লাতুল কদর বলার কারণ এই যে, কর্মহীনতার কারণে এর পূর্বে যার কোন সম্মান ও মূল্য থাকে না, সে এ রাত্রিতে তওবা-ইস্তেগফার ও ইবাদতের মাধ্যমে সম্মানিত ও মহিমান্বিত হয়ে যায়।

কদরের আরেক অর্থ তকদীর এবং আদেশও হয়ে থাকে। এ রাত্রিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতা-গণকে লিখে দেওয়া হয়, এমনকি, এ বছর কে হজ্জ করবে, তাও লিখে দেওয়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তি অনুযায়ী চারজন ফেরেশতাকে এসব কাজ সোপর্দ করা হয়। তারা হলেন—ইসরাফীল, মীকাঈল, আযরাঈল ও জিবরাঈল (আ)।---(কুরতুবী)

সূরা দোখানে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا ـ

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, এ পবিত্র রাতে তকদীর সংক্রান্ত সব ফয়সালা লিপিবদ্ধ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ليلة مباركة -এর অর্থ শবে-কদরই। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন মধ্য শাবানের রাত্রি অর্থাৎ শবে-বরাত। তাঁরা বলেন যে, তকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রাথমিক ও সংরক্ষিত ফয়সালা শবে বরাতেই হয়ে যায়। অতঃপর তার বিশদ বিবরণ শবে-কদরে লিপিবদ্ধ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। বগভীর রেওয়ায়েতে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সারা বছরের তকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদির ফয়সালা শবে-বরাতে সম্পন্ন করেন; অতঃপর শবে-কদরে এসব ফয়সালা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়।--(মাযহারী) পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই রাত্রিতে তকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পন্ন হওয়ার অর্থ এ বছর যেসব বিষয় প্রয়োগ করা হবে, সেগুলো লওহে মাহফূয থেকে নকল করে ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা। নতুবা আসল বিধিলিপি আদিকালেই লিখিত হয়ে গেছে।

শবে-কদর কোন্ রাত্রি ঃ কোরআন পাকের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শবে-কদর রমযান মাসে। কিন্তু সঠিক তারিখ সম্পর্কে আলিমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে যা সংখ্যায় চল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছে। তফসীরে মাযহারীতে আছে এসব উক্তির নির্ভুল তথ্য এই যে, শবে-কদর রমযান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে আসে কিন্তু এরও কোন তারিখ নির্দিষ্ট নেই বরং যে কোন রাত্রিতে হতে পারে। প্রত্যেক রমযানে তা পরিবর্তিতও হয়। সহীহ্ হাদীসদৃষ্টে এই দশ দিনের বেজোড় রাত্রিগুলোতে শবে-কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যদি শবে-কদরকে রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে ঘূর্ণায়মান এবং প্রতি রমযানে পরিবর্তনশীল মেনে নেওয়া যায়, তবে শবে-কদরের দিন তারিখ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাই অধিকাংশ ইমাম এ মতই পোষণ করেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (র)-র এক উক্তি এই যে, শবে-কদর নির্দিষ্ট দিনেই হয়ে থাকে।---(ইবনে কাসীর)

সহীহ্ বুখারীর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ تحروا ليلة القدر فى العشر الاواخر من رمضان--অর্থাৎ রমযানের শেষ দশকে শবে-কদর অন্বেষণ কর। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে ঃ فاطلبوها فى الوتر منها--অর্থাৎ শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে তালাশ কর।---(মাযহারী)

শবে-কদরের কতক ফযীলত ও তাঁর বিশেষ দোয়া ঃ এ রাত্রির সর্ববৃহৎ ফযীলত তো আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে যে, এক রাত্রির ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এক হাজার মাসে তিরাশি বছরের কিছু বেশী হয়। এই শ্রেষ্ঠত্ব কতগুণ, তার কোন সীমা নেই। অতএব দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, দশ গুণ, শতগুণ সবই হতে পারে।

বুখারী ও মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি শবে-কদরে ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকে, তার অতীত সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ শবে-কদরে সিদরাতুল-মুন্তাহায় অবস্থানকারী সব ফেরেশতা জিবরাঈলের সাথে দুনিয়াতে অবতরণ করে এবং মদ্যপায়ী ও শূকরের মাংস ভক্ষণকারী ব্যতীত প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ ও নারীকে সালাম করে।

অন্য এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে, সে সম্পূর্ণই বঞ্চিত ও হতভাগ্য। শবে-কদরে কেউ কেউ বিশেষ নূরও প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু এটা সবাই লাভ করতে পারে না এবং শবে-কদরের বরকত ও সওয়াব হাসিল হওয়ার ব্যাপারে এরূপ দেখার কোন দখলও নেই। কাজেই এর পেছনে পড়া উচিত নয়।

হযরত আয়েশা (রা) একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ যদি আমি শবে-কদর পাই, কি দোয়া করব? উত্তরে তিনি বললেনঃ এই দোয়া করোঃ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ হে আল্লাহ্, আপনি অত্যন্ত ক্ষমতাশীল। ক্ষমা আপনার পছন্দনীয়। অতএব আমার গোনাহ্সমূহ মার্জনা করুন।—(কুরতুবী)

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ—এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, কোরআন পাক শবে-কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক অর্থ এও হতে পারে যে, সমগ্র কোরআন লওহে-মাহফূয থেকে শবে-কদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর জিবরাঈল একে ধীরে ধীরে তেইশ বছর ধরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছাতে থাকেন। দ্বিতীয় এই হতে পারে যে, এ রাতে কয়েকটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে সূচনা হয়ে যায়। এরপর অবশিষ্ট কোরআন পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়।

সমস্ত ঐশী কিতাব রমযানেই অবতীর্ণ হয়েছেঃ হযরত আবূ যর গিফারী (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাসমূহ ৩রা রমযানে, তওরাত ৬ই রমযানে, ইনজীল ১৩ই রমযানে এবং যবূর ১৮ই রমযানে অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআন পাক ২০শে রমযানুল-মুবারকে নাযিল হয়েছে।—(মাযহারী)

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ—রূহ—বলে জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে।

হাদীসে আছে, শবে-কদরে জিবরাঈল ফেরেশতাদের বিরাট একদল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ

করেন এবং যত নারী -পুরুষ নামায অথবা যিকিরে মশগুল থাকে, তাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন।--- (মাযহারী)

مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ——অর্থাৎ ফেরেশতাগণ শবে-কদরে সারা বছরের অবধারিত ঘটনাবলী নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। কোন কোন তফসীরবিদ একে سلام -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এ অর্থ করেছেন যে, এ রাত্রিটি যাবতীয় অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে শান্তিস্বরূপ।---(ইবনে কাসীর)

سَلٰمٌ ——অর্থাৎ এ রাত্রি শান্তিই শান্তি, মঙ্গলই মঙ্গল। এতে অনিষ্টের নামও নেই। (কুরতুবী) কেউ কেউ একে من كل امر-এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন---ফেরেশতাগণ প্রত্যেক শান্তি ও কল্যাণকর বিষয় নিয়ে আগমন করে।---(মাযহারী)

هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ——অর্থাৎ শবে-কদরের এই বরকত রাত্রির কোন বিশেষ অংশে সীমিত নয় বরং ফজরের উদয় পর্যন্ত বিস্তৃত।

জ্ঞাতব্য ঃ এ সূরায় শবে-কদরকে এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই এক হাজার মাসের মধ্যে প্রতি বছর শবে-কদর আসবে। অতএব হিসাব কিরূপে হবে? তফসীরবিদগণ বলেছেন, এখানে এমন এক হাজার মাস বোঝানো হয়েছে, যাতে 'শবে-কদর' নেই। অতএব কোন অসুবিধা নেই।—(ইবনে কাসীর)

উদয়াচলের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দিনে শবে-কদর হতে পারে। প্রত্যেক দেশের দিক দিয়ে যে রাত্রি কদরের রাত্রি হবে, সে রাত্রিতেই শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত হাসিল হবে।

মাস'আলা ঃ যে ব্যক্তি শবে-কদরে ইশা ও ফজরের নামায জামা'আতের সাথে পড়ে নেয়, সে-ও এ রাত্রির সওয়াব হাসিল করে। যে ব্যক্তি যত বেশী ইবাদত করবে, সে তত বেশী সওয়াব পাবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইশার নামায জামা'আতের সাথে পড়ে, সে অর্ধ রাত্রির সওয়াব অর্জন করে। যদি সে ফজরের নামাযও জামা'আতের সাথে পড়ে নেয়, তবে সমস্ত রাত্রি জাগরণের সওয়াব হাসিল করে।

سورة البينة

সূরা বাইয়্যিনাহ্

মক্কায় অবতীর্ণ, ৮ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٣﴾ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا

لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا

الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي

نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي

مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ

لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তারা প্রত্যাবর্তন করত না, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। (২) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একজন রসূল, যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা, (৩) যাতে আছে, সঠিক বিষয়বস্তু। (৪) অপর কিতাব প্রাপ্তরা যে বিভ্রান্ত হয়েছে তা হয়েছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। (৫) তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠ-ভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (৬) আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম। (৭) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম

করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। (৮) তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।

তফসীরের সার সংক্ষেপ

কিতাবধারী ও মুশরিকদের মধ্যে যারা (পয়গম্বরের আবির্ভাবের পূর্বে) কাফির ছিল, তারা (তাদের কুফর থেকে কখনও) বিরত হত না, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত; (অর্থাৎ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন রসূল, যিনি (তাদেরকে) পবিত্র সহীফা পাঠ করে শোনাতেন, যাতে আছে সঠিক বিষয়বস্তু। (অর্থাৎ কোরআন। উদ্দেশ্য এই যে, এই কাফিরদের কুফর এমন শক্ত ছিল এবং তারা এমন কঠিন মূর্খতায় লিপ্ত ছিল যে, কোন রসূল ব্যতীত তাদের পথে আসা ছিল সুদূরপরাহত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিরুত্তর করার জন্য আপনাকে কোরআন দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাদের উচিত ছিল একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করা এবং কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।) আর যারা কিতাব-প্রাপ্ত ছিল, (যারা কিতাবপ্রাপ্ত নয়, তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য) তারা যে বিভ্রান্ত হয়েছে (দীনের ব্যাপারে) তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। (অর্থাৎ সত্য ধর্মের সাথেও মতানৈক্য করেছে এবং পূর্ব থেকে যে পারস্পরিক মতানৈক্য ছিল, তাও সত্য ধর্মের অনুসরণের মাধ্যমে দূর করেনি। মুশরিকদের কথা না বলার কারণ এই যে, তাদের কাছে তো পূর্ব থেকেও কোন ঐশী জ্ঞান ছিল না)। অথচ তাদেরকে (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে) এ আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা খাঁটি মনে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে (মিছামিছি কাউকে আল্লাহ্র অংশীদার করবে না।) নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। [সারকথা, আহ্লে কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা কোরআন ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ বলে উপরে কোরআনের শিক্ষাও তাই বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং কোরআনকে অমান্য করার কারণে তাদের কিতাবেরও বিরোধিতা হয়ে গেছে। এ হচ্ছে আহলেকিতাবদের দোষ। মুশরিকরা পূর্ববর্তী কিতাব না মানলেও ইবরাহীম (আ)-এর তরীকা যে সত্য, তা স্বীকার করত। আর এটা সুনিশ্চিত যে, ইবরাহীম (আ) শিরক থেকে মুক্ত ছিলেন। কোরআনও এ তরীকার সাথে একমত। সুতরাং মুশরিকদের জন্যও প্রমাণ পূর্ণ হয়ে গেছে। এখানে বিভক্ত ও বিরোধী বলে সেসব কাফিরকে বোঝানো হয়েছে, যারা ঈমান আনেনি। এ থেকে জানা গেল যে, যারা বিভেদ ও বিরোধিতা করেনি, তারা ঈমানদার। অতঃপর আহলে-কিতাব, মুশরিক ও মু'মিনদের শাস্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে—] নিশ্চয় আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে, আর তারাই হল সৃষ্টির অধম। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান—চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের

প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে (অর্থাৎ তারাও কোন গোনাহ্ করবে না এবং তাদের সাথেও কোন অপ্রিয় ব্যবহার করা হবে না)। এটা (অর্থাৎ জান্নাত ও সন্তুষ্টি) তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে। আল্লাহ্‌কে ভয় করলেই ঈমান ও সৎ কর্ম সম্পাদিত হয়, যা জান্নাত ও সন্তুষ্টি লাভের চাবিকাঠি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়াতে কুফর, শিরক ও মূর্খতার ঘোর অন্ধকারের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এহেন সর্বগ্রাসী অন্ধকার দূর করার জন্য একজন পারদর্শী সংস্কারক প্রেরণ করা ছিল অপরিহার্য। রোগ যেমন জটিল ও বিশ্বব্যাপী, তার প্রতিকারের জন্য চিকিৎসকও তেমনি সুনিপুণ ও বিচক্ষণ হওয়া দরকার। অন্যথায় রোগ নিরাময়ের আশা সুদূরপরাহত হতে বাধ্য। অতঃপর সেই বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকের গুণাগুণ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁর অস্তিত্ব একটি 'বাইয়্যিনাহ্' অর্থাৎ কুফর ও শিরককে অসার প্রতিপন্ন করার জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরপর বলা হয়েছে যে, এই চিকিৎসক হলেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত একজন রসূল, যিনি কোরআনের সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে আগমন করেছেন। এ পর্যন্ত আয়াত থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল—এক. পয়গম্বর প্রেরণের পূর্বে দুনিয়াতে বিরাট অনর্থ এবং মূর্খতার অন্ধকার বিরাজমান ছিল এবং দুই. রসূলুল্লাহ্ (সা) মহান মর্যাদার অধিকারী। অতঃপর কোরআনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ—يَتْلُوا শব্দটি تلاوت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ 'পাঠ করা'। তবে যে কোন পাঠকেই তিলাওয়াত বলা যায় না বরং যে পাঠ পাঠদানকারীর প্রদত্ত অনুশীলনের সম্পূর্ণ অনুরূপ হবে তাকেই 'তিলাওয়াত' বলা হয়। তাই পরিভাষায় সাধারণত কোরআন পাঠ করার ক্ষেত্রে 'তিলাওয়াত' শব্দ ব্যবহৃত হয়। صحف শব্দটি صحيفة-এর বহুবচন। যেসব কাগজে কোন বিষয়বস্তু লিখিত থাকে সেগুলোকেই বলা হয় সহীফা। كتب শব্দটি كتاب-এর বহুবচন। এর অর্থ লিখিত বস্তু। এদিক দিয়ে কিতাব ও সহীফা সমার্থবোধক। কিতাব অর্থ কোন সময় আদেশও হয়ে থাকে। যেমন, এক আয়াতে আছে لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ—এখানেও এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অন্যথায় فيها বলার কোন মানে থাকে না।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুশরিক ও আহলে-কিতাবদের পথভ্রষ্টতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে সরে আসা সম্ভবপর ছিল না, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আল্লাহ্‌র কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে রসূলকে সুস্পষ্ট প্রমাণরূপে প্রেরণ করেন। তাঁর কর্তব্য ছিল তাদেরকে পবিত্র সহীফা তিলাওয়াত করে শুনানো অর্থাৎ তিনি সেসব বিধান শুনাতেন, যা পরে সহীফার মাধ্যমে সংরক্ষিত

করা হয়। কেননা, প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সহীফা থেকে নয়—স্মৃতি থেকে পাঠ করে শুনাতেন। এসব সহীফায় ন্যায় ও ইনসাফ সহকারে প্রদত্ত ও চিরন্তন বিধি-বিধান লিখিত ছিল।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ

—এর অর্থ এখানে বিরোধ ও অস্বীকার করা। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্ম ও আবির্ভাবের পূর্বে আহলে-কিতাবরা তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করত। কেননা, তাদের ঐশী গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জীল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত, তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণাবলী ও তাঁর প্রতি কোরআন অবতরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা ছিল। তাই ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন বিরোধ ছিল না যে, শেষ যমানায় মুহাম্মদ মোস্তফা (সা) আগমন করবেন, তাঁর প্রতি কোরআন নাযিল হবে এবং তাঁর অনুসরণ সবার জন্য অপরিহার্য হবে।

কোরআন পাকেও তাদের এই ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا——অর্থাৎ আহলে-কিতাবরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং যখনই মুশরিকদের সাথে তাদের মুকাবিলা হত, তখনই তাঁর মধ্যস্থতায় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বিজয় কামনা করে দোয়া করত যে, শেষ নবীর বরকতে আমাদেরকে সাফল্য দান করা হোক। অথবা তারা মুশরিকদেরকে বলত ঃ তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষা করছ বটে, কিন্তু সত্বরই একজন রসূল আসবেন, যিনি তোমাদেরকে পদানত করবেন। আমরা তাঁর সাথে থাকব, ফলে আমাদেরই বিজয় হবে।

সারকথা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আগমনের পূর্বে আহলে-কিতাবরা সবাই তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে অভিন্ন মত পোষণ করত কিন্তু যখন তিনি আগমন করলেন, তখন তারা অস্বীকার করতে লাগল। কোরআনের অন্য এক আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ——অর্থাৎ তাদের কাছে যখন পরিচিত রসূল সত্য ধর্ম অথবা কোরআন আগমন করল, তখন তারা কুফর করতে লাগল। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আশ্চর্যের বিষয়, রসূলের আগমন ও তাঁকে দেখার পূর্বে তো তাদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে কোন মতবিরোধ ছিল না; সবাই তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে একমত ছিল কিন্তু যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ শেষ নবী আগমন করলেন, তখন তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। কেউ তো বিশ্বাস স্থাপন করে মু'মিন হল এবং অনেকেই কাফির হয়ে গেল।

এ ব্যাপারটি কেবল আহলে-কিতাবদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে—মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু প্রথম ব্যাপারে উভয় দলই শরীক ছিল,

তাই প্রথম আয়াতে উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ বলা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপে দ্বিতীয় ব্যাপারেও মুশরিক এবং আহলে-কিতাব—উভয় সম্প্রদায়কে শামিল করে তফসীর করা হয়েছে।

وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ——অর্থাৎ আহলে-কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল খাঁটি মনে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে, নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে। এরপর বলা হয়েছে, এটা কেবল তাদেরই বৈশিষ্ট্য নয়, প্রত্যেক সঠিক মিল্লাতের অথবা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের তরীকাও তাই। বলা বাহুল্য, كتب শব্দটি قيمة -এর বিশেষণ হলে এর উদ্দেশ্য কোরআনী বিধি-বিধান হবে এবং আয়াতের মতলব হবে এই যে, মোহাম্মদী শরীয়ত প্রদত্ত বিধি-বিধানও হুবহু তাই, যা তাদের কিতাব তাদেরকে পূর্বে দিয়েছিল। ভিন্ন বিধি-বিধান হলে অবশ্য তারা বিরোধিতার বাহানা পেত। কিন্তু এখন সে সুযোগ নেই।

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ——এ আয়াতে জান্নাতীদের প্রতি সর্বরৃহৎ নিয়ামত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন ঃ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ (হে জান্নাতীগণ)। তখন তারা জওয়াব দিবে لبيك ربنا وسعديك والخير كل في يديك হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা উপস্থিত এবং আপনার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন ঃ هل رضيتم তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা জওয়াব দেবে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! এখনও সন্তুষ্ট না হওয়ার কি সম্ভাবনা? আপনি তো আমাদেরকে এত সব দিয়েছেন, যা অন্য কোন সৃষ্টি পায়নি। আল্লাহ্ বলবেন, আমি তোমাদেরকে আরও উত্তম নিয়ামত দিচ্ছি। আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি নাযিল করছি। অতঃপর কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।—(বুখারী, মুসলিম)

আলোচ্য আয়াতেও খবর দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতীরাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর প্রতিটি আদেশ ও কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতেই পারে না। এমতাবস্থায় এখানে জান্নাতীদের সন্তুষ্টি উল্লেখ করার

তাৎপর্য কি? জওয়াব এই যে, সন্তুষ্টির এক স্তর হল প্রত্যেক আশা ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া এবং কোন কামনা অপূর্ণ না থাকা। এখানে সন্তুষ্টি বলে এই স্তরই বোঝানো হয়েছে। উদাহরণত সূরা যোহায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ঃ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ অর্থাৎ সত্বরই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এমন বস্তু দান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এখানে অর্থ চূড়ান্ত বাসনা পূর্ণ করা। এ কারণেই এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তা হলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার একটি উম্মতও জাহান্নামে থাকবে।—(মাযহারী)

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ——সূরার উপসংহারে আল্লাহ্র ভয়কে সমস্ত ধর্মীয় উৎকর্ষ এবং পারলৌকিক নিয়ামতের ভিত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোন শত্রু, হিংস্র জন্তু অথবা ইতর প্রাণী দেখে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাকে خشية বলা হয় না বরং কারও অসাধারণ মাহাত্ম্য ও প্রতাপ থেকে যে ভয়-ভীতির উৎপত্তি, তাকেই خشية বলা হয়। এই ভয়ের প্রেক্ষিতে সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সত্তার সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা হয় এবং অসন্তুষ্টির সন্দেহ থেকেও আত্মরক্ষা করা হয়। এই ভীতিই মানুষকে কামিল ও প্রিয় বান্দায় পরিণত করে।

سورة الزلزال

সূরা যিলযাল

মদীনায় অবতীর্ণ, ৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝٢ وَقَالَ
الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝٣ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝٤ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝٥
يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ۚ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝٦ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْرًا يَرَهُ ۝٧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, (২) যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে (৩) এবং মানুষ বলবে, এর কি হল ? (৪) সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, (৫) কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। (৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে ; যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। (৭) অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করলে তা দেখতে পাবে (৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন পৃথিবী তার কঠিন কম্পনে প্রকম্পিত হবে এবং পৃথিবী তার বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে, (বোঝা বলে ভূগর্ভস্থ ধন-ভাণ্ডার ও মৃতদেরকে বোঝানো হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, পূর্বেও ভূগর্ভস্থ অনেক কিছু বাইরে চলে আসবে। কিয়ামতের পূর্বে যেসব ভূগর্ভস্থ সম্পদ বাইরে আসবে ; সেগুলো সম্ভবত কালপ্রবাহে আবার মাটির নিচে চাপা পড়ে যাবে এবং কিয়ামতের দিন আবার বের হবে। ভূগর্ভস্থ ধনসম্পদ বাইরে চলে আসার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, যারা ধনসম্পদকে অত্যধিক ভালবাসে, তারা যাতে স্বচক্ষে ধনসম্পদের অসারতা প্রত্যক্ষ করে নেয়)। এবং (এই পরিস্থিতি দেখে) মানুষ বলবে, এর কি

হল (যে, এভাবে প্রকম্পিত হচ্ছে এবং সব গুপ্ত ভাণ্ডার বাইরে চলে আসছে)? সেদিন পৃথিবী তার (ভাল-মন্দ) বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। (হাদীসে এর তফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—পৃথিবীতে যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করবে ভাল অথবা মন্দ—পৃথিবী তা বলে দেবে। এটা হবে তার সাক্ষ্য)। সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে (হিসাবের ময়দান থেকে) ফিরবে (অর্থাৎ যাদের হিসাব সমাপ্ত হবে, তারা জান্নাতী ও জাহান্নামী দলে বিভক্ত হয়ে জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে রওয়ানা হবে) যাতে তারা তাদের কৃতকর্ম (অর্থাৎ কৃতকর্মের ফলাফল) দেখে নেয়। অতএব যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করবে, সে তা দেখবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করবে, সেও তা দেখবে (যদি সৎ-অসৎ তখন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। নতুবা যদি কুফরের কারণে সৎ কর্ম ধ্বংস হয়ে যায় অথবা ঈমান ও তওবার কারণে অসৎ কর্ম মিটে যায়, তবে তা কিয়ামতের দিন দেখা যাবে না। কেননা, তখন সেই সৎ কর্ম সৎ কর্ম নয় এবং অসৎ কর্ম অসৎ কর্ম নয়। তাই সামনে আসবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا—আয়াতে প্রথম শিংগা ফুঁকার পূর্বেকার ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। প্রথম ফুৎকারের পূর্বেকার ভূকম্পন কিয়ামতের আলামত-সমূহের মধ্যে গণ্য হয় এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পনের পর মৃতরা জীবিত হয়ে কবর থেকে উত্থিত হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও তফসীরবিদগণের উক্তি এ ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ যে, আলোচ্য আয়াতে কোন্ ভূকম্পন ব্যক্ত হয়েছে। তবে এ স্থলে দ্বিতীয় ভূকম্পন বোঝানোর সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ, এরপর কিয়ামতের অবস্থা তথা হিসাব-নিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।—(মাযহারী)

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا—এই ভূকম্পন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিশালকায় স্বর্ণখণ্ডের আকারে উদগীরণ করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধনসম্পদের জন্য কাউকে হত্যা করেছিল সে তা দেখে বলবে, এর জন্যই কি আমি এতবড় অপরাধ করেছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক-ছেদ করেছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম? চুরির কারণে যার হাত কাটা হয়েছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম? অতঃপর কেউ এসব স্বর্ণখণ্ডের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না।—(মুসলিম)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ—আয়াতে خير বলে শরীয়তসম্মত সৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে; যা ঈমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা, ঈমান ব্যতীত

কোন সৎ কর্মই আল্লাহ্‌র কাছে সৎ কর্ম নয়। কুফর অবস্থায় কৃত সৎ কর্ম পরকালে ধর্তব্য হবে না যদিও দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেওয়া হয়। তাই এ আয়াতকে এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় যে, যার মধ্যে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে অবশেষে জাহান্নাম থেকে বের করে নেওয়া হবে। কেননা, এ আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী প্রত্যেকের সৎ কর্মের ফল পরকালে পাওয়া জরুরী। কোন সৎ কর্ম না থাকলেও স্বয়ং ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে মু'মিন ব্যক্তি যত বড় গোনাহ্‌গারই হোক, চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিন্তু কাফির ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন সৎকর্ম করে থাকলে ঈমানেরও অভাবে তা পণ্ডশ্রম মাত্র। তাই পরকালে তার কোন সৎ কাজই থাকবে না।

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ—জীবদ্দশায় তওবা করেনি—এখানে এমন অসৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন ও হাদীসে অকাট্য প্রমাণ আছে যে, তওবা করলে গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। তবে যে গোনাহ থেকে তওবা করেনি, তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক—পরকালে অবশ্যই সামনে আসবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেছিলেন, দেখ, এমন গোনাহ থেকেও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও, যাকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা হয়। কেননা, এর জন্যও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হবে।—(নাসায়ী, ইবনে মাযা)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেনঃ কোরআনের এ আয়াতটি সর্বাধিক অটল ও ব্যাপক অর্থবোধক। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াতকে الفاذة الجامعة—অর্থাৎ একক, অনন্য ও সর্বব্যাপক বলে অভিহিত করেছেন।

হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) সূরা যিলযালকে কোরআনের অর্ধেক, সূরা ইখলাসকে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরূনকে কোরআনের এক-চতুর্থাংশ বলেছেন।—(মাযহারী)

سورة العاديات

সূরা আদিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ, ১১ আয়ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝١ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝٢ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝٣ فَاَثَرْنَ بِهٖ
نَقْعًا ۝٤ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝٥ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝٦
وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝٧ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝٨ اَفَلَا
يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۝٩ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۝١٠
اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۝١١

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের, (২) অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিনির্গত-কারী অশ্বসমূহের (৩) অতঃপর প্রভাতকালে লুটতরাজকারী অশ্বসমূহের (৪) ও যারা সে সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে (৫) অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে---(৬) নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ (৭) এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত (৮) এবং সে নিশ্চিতই ধনসম্পদের ভালবাসায় মত্ত (৯) সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে, তা উত্থিত হবে (১০) এবং অন্তরে যা আছে, তা অর্জন করা হবে? (১১) সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বসমূহের, অতঃপর যারা (প্রস্তরে) ক্ষুরাঘাতে অগ্নি নির্গত করে, অতঃপর প্রভাতকালে লুটতরাজ করে, অতঃপর সে সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে ও শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে, (এখানে যুদ্ধের অশ্বসমূহ বোঝানো হয়েছে। আরব দুর্ধর্ষ জাতি বিধায় যুদ্ধের জন্য অশ্ব পালন করত। অশ্বের সাথে তাদের এ সংযোগের প্রেক্ষিতে সামরিক অশ্বের শপথ করা হয়েছে। অতঃপর শপথের জওয়াবে বলা হচ্ছে ঃ) নিশ্চয়

(যেসব) মানুষ (কাফির) তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। সে নিজেও এ সম্পর্কে অবহিত (কখনও প্রথমেই এবং কখনও চিন্তাভাবনার পর অকৃতজ্ঞতা অনুভব করে।) সে অবশ্যই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মত্ত। (এটাই তার অকৃতজ্ঞতার কারণ। অতঃপর এর জন্য শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে ঃ) সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে, তা উত্থিত হবে এবং অন্তরে যা আছে, তা প্রকাশ করা হবে? সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ অবহিত। (ফলে তিনি তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। মোট কথা, মানুষ যদি সেই সংকটময় মুহূর্ত সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত হত, তবে অকৃতজ্ঞতা ও ধনসম্পদের লালসা থেকে অবশ্যই বিরত হত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আদিয়াত হযরত ইবনে মসউদ, জাবের হাসান বসরী, ইকরিমা ও আতা (রা) প্রমুখের মতে মক্কায় অবতীর্ণ এবং ইবনে আব্বাস, আনাস (রা), ইমাম মালিক ও কাতাদাহ্ (র) প্রমুখের মতে মদীনায় অবতীর্ণ।—(কুরতুবী)

এ সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা সামরিক অশ্বের কতিপয় বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শপথ করে বলেছেন যে, মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। একথা বার বার বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সৃষ্টির মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর শপথ করে বিশেষ ঘটনাবলী ও বিধানাবলী বর্ণনা করেন। এটা আল্লাহ্ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। মানুষের জন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা বৈধ নয়। শপথ করার লক্ষ্য নিজের বক্তব্যকে বাস্তবসম্মত ও নিশ্চিত প্রকাশ করা। কোরআন পাক যে বস্তুর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করে, বর্ণিত বিষয় সপ্রমাণে সে বস্তুর গভীর প্রভাব থাকে। এমনকি, সে বস্তু যেন সে বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্যদান করে। এখানে সামরিক অশ্বের কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার উল্লেখ যেন মানুষের অকৃতজ্ঞতার সাক্ষ্যস্বরূপ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, অশ্ব বিশেষত সামরিক অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের আদেশ ও ইঙ্গিতের অনুসারী হয়ে কত কঠোর খেদমতই না আনজাম দিয়ে থাকে। অথচ এসব অশ্ব মানুষ সৃষ্টি করেনি। তাদেরকে যে ঘাস-পানি মানুষ দেয়, তাও তার সৃজিত নয়। আল্লাহ্র সৃষ্টি করা জীবনোপকরণকে মানুষ তাদের কাছে পৌঁছে দেয় মাত্র। এখন অশ্বকে দেখুন, সে মানুষের এতটুকু অনুগ্রহকে কিভাবে চিনে এবং স্বীকার করে! তার সামান্য ইশারায় সে তার জীবনকে সাক্ষাৎ বিপদের মুখে ঠেলে দেয়, কঠোরতর কষ্ট সহ্য করে। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এক ফোঁটা তুচ্ছ বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন কাজের শক্তি দিয়েছেন, বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন, তার পানাহারের সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য করে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু সে এতসব উচ্চস্তরের অনুগ্রহেরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। এবার শব্দার্থের প্রতি লক্ষ্য করুন—عاديات শব্দটি عدو থেকে উদ্ভূত। অর্থ দৌড়ানো। ضبحا—ঘোড়ার দৌড় দেওয়ার সময় তার বক্ষ থেকে নির্গত আওয়াজকে বলা হয়। موريات শব্দটি ايراء থেকে উদ্ভূত।

অর্থ অগ্নি নির্গত করা; যেমন চকমকি পাথর ঘষে অথবা দিয়াশলাই ঘষা দিয়ে অগ্নি নির্গত করা হয়। قدح-এর অর্থ ক্ষুরাঘাত করা। লৌহজুতা পরিহিত অবস্থায় ঘোড়া যখন প্রস্তরময় মাটিতে ক্ষুরাঘাত করে দৌড় দেয় তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় مغيرات শব্দটি اغارة থেকে উদ্ভূত। অর্থ হামলা করা, হানা দেওয়া। صبحا আরবদের অভ্যাস হিসাবে প্রভাতকালের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বীরত্ববশত রাত্রির অন্ধকারে হানা দেওয়া দূষণীয় মনে করত। তাই তারা ভোর হওয়ার পর এ কাজ করত। اثرن শব্দটি اثارة থেকে উৎপন্ন। অর্থ ধূলি উড়ানো। نقع ধূলিকে বলা হয়। অর্থাৎ অশ্বসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে এত দ্রুত ধাবমান হয় যে, তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়ে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিশেষত প্রভাতকালে ধূলি উড়া অধিক দ্রুতগামিতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, স্বভাবত এটা ধূলি উত্থিত হওয়ার সময় নয়। ভীষণ দৌড় দ্বারাই ধূলি উড়তে পারে।

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا—অর্থাৎ এসব অশ্ব শত্রুদলের অভ্যন্তরে নির্ভয়ে ঢুকে পড়ে।

كنود হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ এর অর্থ সে ব্যক্তি, যে বিপদ স্মরণ রাখে এবং নিয়ামত ভুলে যায়।

আবূ বকর ওয়াসেতী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহকে গোনাহের কাজে ব্যয় করে, তাকে كنود বলা হয়। তিরমিযীর মতে এর অর্থ যে নিয়ামত দেখে কিন্তু নিয়ামতদাতাকে দেখে না। এসব উক্তির সারমর্ম নিয়ামতের নাশোকরী করা।

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ—خير-এর শাব্দিক অর্থ মঙ্গল। আরবে ধন-সম্পদকেও خير বলে ব্যক্ত করা হয়; যেন ধনসম্পদ মঙ্গলই মঙ্গল এবং উপকারই উপকার। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ধনসম্পদ মানুষকে হাজারো বিপদে জড়িত করে দেয়। পরকালে তো হারাম ধনসম্পদের পরিণতি তাই হবে; দুনিয়াতেও তা মানুষের জন্য বিপদ হয়ে যায়। কিন্তু আরবের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী এ আয়াতে ধনসম্পদকে خير বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আছে — اِنْ تَرَكَ خَيْرًا

উপরোক্ত আয়াতে অশ্বের শপথ করে মানুষ সম্পর্কে দু'টি কথা ব্যক্ত করা হয়েছে— এক. মানুষ অকৃতজ্ঞ, সে বিপদাপদ ও কষ্ট স্মরণ রাখে এবং নিয়ামত ও অনুগ্রহ ভুলে যায়। দুই. সে ধনসম্পদের লালসায় মত্ত। উভয় বিষয় শরীয়ত ও যুক্তির নিরিখে নিন্দনীয়। অকৃতজ্ঞতা যে নিন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তবে ধনসম্পদ মানুষের প্রয়োজনাদির ভিত্তি। এর উপার্জন শরীয়তে কেবল হালালই নয় বরং প্রয়োজনমাফিক ফরযও বটে। সুতরাং ধনসম্পদের ভালবাসা নিন্দনীয় হওয়ার এক কারণ তাতে এমন